কখনো ভেবেছেন কি ?

ডঃ সুভাষ সান্যাল

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশকঃ

শ্রী সুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মূল্য : ১২ টাকা

মুদ্রক :

শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

দিদি (কৃষ্ণা বসু) কে :—

সুভাষ

কৈফিয়ত

দিনের শুরু থেকে শেষ—প্রায় প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু ভেবে চলতে হয় আমাদের। শুনতে খারাপ লাগে, তবু একথা সত্যি যে আজ আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায় সারাটা দিন—অন্য কিছু নিয়ে সেভাবে চিন্তাভাবনাও আর করে ওঠা হয় না। তবু চলতে ফিরতে মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে—এটা কেন হচ্ছে, ওটা কেন হলো, এই কাজটা ঠিক করলাম তো? এ চিন্তা কখন যে কিভাবে মাথায় আসবে বলা শক্ত—বাসে যেতে যেতে, পথ চলতে, খেলার মাঠে এমন কি কোন উৎসব অনুষ্ঠানের মাঝেও এমনি নানা প্রশ্ন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনের কোনে উঁকি দিয়ে চলে যায়। অবশ্য অধিকাংশ মানুষই এই তাৎক্ষণিক বিষয়গুলো মাথায় রাখেন না, একটু পরেই তা ভুলে যান। অথচ টুকিটাকি নানা দৈনন্দিন ঘটনার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের মনকে অনেক সময়ই নাড়া দিয়ে যায় আর তখনই বলতে ইচ্ছে করে—ঈস্, এটা নিয়ে কখনো ভাবি নি তো! আসলে আমাদের চারপাশে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের ভাবা দরকার যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে। বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে সেই চিন্তাধারা আমাদের আবাল্য লালিত অনেক কুসংস্কারের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে বা অনেক আবছা ধারণাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সাহায্য করছে।

বস্তুতপক্ষে, লেখার জন্য এ ধরনের বিষয় নির্বাচনের উৎসাহ প্রথম পাই 'উৎসমানুষ' পত্রিকার তরফ থেকে, এবং এই সংকলনের অনেক রচনাই প্রকাশিত হয়েছে উৎসমানুষ, আজকাল, নবান্ন ভারতী প্রভৃতি পত্রপত্রিকাতে। বিভিন্ন সময়ে লেখা—প্রকাশ ভঙ্গিও তাই বোধহয় ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ; বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রকৃতিগত তফাতটাও তাই এক্ষেত্রে চোখে পড়ছে চট্ করে।

কৈফিয়তের ফিরিস্তি অবশ্য এখানেই শেষ নয়, অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ কিছু কিছু রয়ে গেছে। আশা করবো পাঠক পাঠিকারা নিজগুণে এই ত্রুটিগুলো ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। তবু বলি— 'খুঁতো' এই বইটি বিষয়গুলোর গুরুত্ব নিয়ে কাউকে সামান্যতমও ভাবাতে যদি পারে তবে এই প্রচেষ্টা আমার সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরিশেষে ধন্যবাদের পালা। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো একসঙ্গে করে সঙ্কলনের উৎসাহ ও সামান্যতম কৃতিত্বও যদি কারো থাকে তবে তা নির্দ্বিধায় 'মণ্ডল এণ্ড সন্স' প্রকাশনা সংস্থার প্রাপ্য। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া 'কখনো ভেবেছেন কি' হয়তো কোনদিনই পাঠক পাঠিকাদের হাতে পৌঁছাতো না।

১লা মে, ১৯৮৬ ডঃ সুভাষ সান্যাল
কলকাতা

আমাদের চারপাশে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের ভাবা দরকার যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সেই চিন্তাধারা আমাদের আবাল্য লালিত অনেক কুসংস্কারের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে বা অনেক আবছা ধারণাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সাহায্য করছে।

বিষয় সূচী ঃ

সিনেমার টিকিট ও একটি প্রাসঙ্গিক সমস্যা

'মধ্যবিত্ত বাঙালীর অবসর বিনোদনের সব থেকে সহজ উপায়টা কি ?' —আপনাকে যদি এই প্রশ্নটা করি, উত্তরে আপনি বলতে বাধ্য হবেন 'সিনেমা'। সত্যিই তাই, একঘেঁয়ে জীবনে কম খরচে বৈচিত্র আনার এটাই বোধ হয় সহজতম রাস্তা। আর সেইজন্যই বোধহয় সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন কম-বেশী প্রায় প্রত্যেক মানুষই।

টিকিট কেটে হলে ঢুকলে দিব্যি ঘণ্টা তিনেক সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়, বোঝাই যায় না। কিন্তু 'টিকিট কাটা' ব্যাপারটাই ভারী ঝামেলার। না, না,—লাইনে দাঁড়ানোর বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা কিংবা টিকিটের কালোবাজারীর কথা বলছি না। কাউন্টারের ওপাশ থেকে ভদ্রলোক যদি জিজ্ঞাসা করেন কোন সারি থেকে দেবো ; তখনই হয় মুশকিল। অধিকাংশ মানুষকেই বলতে শুনেছি—পাশ থেকে দেবেন, আর যতটা পিছিয়ে হয় ততই ভাল। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? কখনো ভেবে দেখেছেন কি—কোন আসনে বসলে সিনেমা দেখার মজাটা, সব থেকে বেশী পাওয়া যেতে পারে ?

শুনতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে সিনেমা দেখার আনন্দ অনেকাংশেই নির্ভর করে 'কোন সিটে বসে দেখছি'—তার ওপর ! ব্যাপারটা নিয়ে একটু বরং চিন্তা করা যাক। 'মোশান পিকচার' তোলা হয় যে সব ক্যামেরা দিয়ে, তাদের 'ফোকাল লেনথ্' সাধারণতঃ খুব কম। এবং এই ছবি বেশ কয়েকশো গুণ বড় করে পর্দায় ফেলে দেখান হয়, সেটা আমরা দেখি, বেশ কয়েকমিটার দূর থেকে। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মানলে বলতে হয়, ছবিটা সব থেকে ভাল দেখতে হলে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

প্রথমতঃ, ছবিটা ভাল দেখাবে যদি দর্শক ক্যামেরার জায়গা থেকে দেখেন, অর্থাৎ পর্দার ঠিক মাঝ বরাবর লাইনে বসলে, এই সুবিধে পাওয়া যাবে। সুতরাং আপনি প্রথমে কাউন্টারের 'বুকিং-চার্টে'

নজর বুলিয়ে নিন একপলক ; সিটের অবস্থান দেখে ঠিক করুন সারির পাশ-বরাবর বা মাঝ-বরাবর—কোথায় বসলে আপনি পর্দার মাঝ-লাইনে থাকবেন।

এবার প্রশ্ন—সামনে বসা ভাল, না পেছনে? এবার আমাদের জানতে হবে পর্দার মাপটা, কত চওড়া। এখানেও হিসেব করে বলা সম্ভব যে পর্দার থেকে দর্শকের দূরত্ব এবং পর্দার মাপের অনুপাত যদি ক্যামেরার ফোকাল লেনথ্ এবং ফিল্মের মাপের অনুপাত বরাবর হয়, আমরা ছবি দেখবো সব থেকে স্পষ্ট। মোটামুটি হিসেবে বলা যায়, অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই যে ধরণের ফোকাল-লেনথ্ বিশিষ্ট ক্যামেরা এবং যে মাপের ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, তাদের মান গড়ে তিন ঃ এক। সুতরাং এই হিসেব থেকে বোঝা শক্ত নয়, আদর্শ সিটটি পর্দার মাপের তিনগুণ দূরত্বে হওয়া উচিত।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এটা জানবো কি করে? খুব সোজা, তবে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। বিরতির সময় বা 'শো' শুরুর আগে পর্দার সামনে দিয়ে একবার হেঁটে নিন। মনে মনে গুনে নিন ক'পা হাঁটলেন। ধরা যাক, আপনি পনেরো পা হেঁটেছেন। এবার এর থেকে তিনগুণ দূরত্ব অর্থাৎ তিন-পনেরো পঁয়তাল্লিশ পা, হলের পেছন পানে হেঁটে যান। দেখে নিন কোন সারিতে এসে থেমেছেন। জেনে রাখুন, ঐ 'রো' বা তার আগে-পরের দুটো রো-ই সিনেমা হলের শ্রেষ্ঠ তিনটি-সারি। আর রোয়ের কোন সিটটি পর্দার মাঝ-বরাবর পড়ছে তা আপনি বুকিং কাউন্টারের চার্ট-থেকে আগেই জেনেছেন। তা-হলে এবার যখন সিনেমা হলের অগ্রিম আসন সংরক্ষণ করবেন, নজর রাখুন শ্রেষ্ঠ আসনটির কত কাছাকাছি যেতে পারছেন আপনি। সেক্ষেত্রে সিনেমা দেখার আনন্দও দেখবেন বেড়ে গেছে অনেকটা। সাদা-কালো বা রঙীন, যাই হোক না কেন, ছবিগুলো মনে হবে আরও বেশী সুন্দর, আরো প্রাণবন্ত।

সিনেমার পাশাপাশি এসে পড়ে টেলিভিশনের কথা। অনেকে বলেন 'টেলিভিশনে' সিনেমা দেখে সুখ নেই। কথাটা কিন্তু মিথ্যে

নয়। আগের দেওয়া হিসেবটা মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে সাধারণ টেলিভিশন সেট, অর্থাৎ যার পর্দার মাপ ৫১ সেন্টিমিটার, তার ছবিটি সব থেকে ভালভাবে দেখা যাবে পর্দার মাঝ-বরাবর পাঁচফুট দূর থেকে। এই দূরত্বে বসে যদি কেউ ছবিও দেখেন, চোখের ওপর খানিকটা বাড়তি চাপ কিন্তু পড়বেই। এর ওপর আছে ঘরে আলো জ্বালানো আর না-জ্বালানোর সমস্যা। অনেক বাড়ীতে এমন দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে, বাড়ীর কর্তা-ঘরের আলো নিভিয়ে দিচ্ছেন, গিন্নী সেটা পরক্ষণেই জ্বালাচ্ছেন। (কিংবা উল্টোটাও হতে পারে !) এক্ষেত্রেও মনে রাখা উচিত, একেবারে আলো না থাকলে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায়, এবং যেহেতু আমাদের অভ্যেস টি. ভি. সেটের খুব কাছাকাছি বসা, সেক্ষেত্রে তা চোখের ওপর বাড়তি চাপ ফেলবেই। তেমনি ঘরের আলো নিয়েও প্রশ্ন আছে। কোন দেয়ালে আলো থাকবে? অনেক বাড়ীতেই দেখা যায় যে দেওয়াল বরাবর টি. ভি. সেটটি আছে, ঠিক তার বিপরীত দেওয়ালে আলোর হোল্ডার। এক্ষেত্রে আলো সরাসরি পড়বে টি. ভি.র পর্দার ওপর, ফলে ছবির উজ্জ্বলতা খানিকটা কমবে। সুতরাং যে ঘরে টি. ভি আছে, সে ঘরে আলো থাকা উচিত টি. ভি. সেটের মাথার ওপর, নিদেনপক্ষে পাশের দেওয়ালে। এক্ষেত্রে ঘরের আলো টি.ভি. দেখার আনন্দ বাড়াবে বই কমাবে না।

ধন্য আশা কুহকিনী

রোজকার নিয়মে ক্লাব ঘরে বসে আছি আমরা পাঁচমূর্তি—সনাতন, পঞ্চানন ওরফে পাঁচু, ত্রিদিব, পান্নু আর আমি। খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে ত্রিদিব বলল—রাজস্থানই ভাল।

বেড়াতে যাবি?—পাশ থেকে ফুট কাটে পান্নু।

বিরক্তভাবে ত্রিদিব বলল—রাজস্থান ভ্রমণ নয়, রাজস্থান স্টেট লটারী। প্রথম পুরস্কার আড়াই লাখ-টাকা। কপালে যদি লেগে যায়, মন্দ কী?

লটারী-ফটারী সব বোগাস। —মন্তব্য করে পাঁচু। মাসে মাসে টাকাটাই শুধু গলে যায়, ফেরত আসে না কিছু। তার থেকে বরং তোরা সবাই আমাকে কুড়িটা করে টাকা দে দেখি—একখানা 'সারপ্রাইজ' যা দেবো না!

ত্রিদিব বলল—একটু ঝেড়ে কাশো তো বাপু। পঞ্চানন হচ্ছে ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, নিজেও খরচ করবে না, অন্যকেও করতে দেবে না। অথচ পাঁচু নিজেই কুড়িটা করে টাকা চাইছে? গভীর রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন!

মিনি লটারী বলতে পারিস। অথচ টাকা মার যাবার ভয় নেই। —পকেট থেকে সিনেমার টিকিটের মতো দুটো পাতলা গোলাপী কাগজ বার করে উঁচিয়ে ধরে পাঁচু।

ওগুলো কী র‍্যা?—কোণ থেকে সনাতনের আওয়াজ পাওয়া যায়।

বললাম তো। মিনি লটারীর টিকিট।—কাগজ দুটো আবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে পাঁচু। কুড়ি টাকার বিনিময়ে পাবি একশো টাকা। একশো টাকা, মানে একশো টাকার স্টীলের বাসন। একটা থালা, একটা বাটি, একটা গেলাস, একটা ডেকচি, একটা হাতা, তিনটে চামচ!

একদম বোগাস।—মন্তব্য করে পান্নু। নয় স্টীলের বদলে লোহা কিংবা স্টীল হলেও তার যা সাইজ হবে, তাই দিয়ে তোর ভাইঝির খেলনা-বাটি হবে।

আজ্ঞে না স্যার। নিজের চোখে না দেখে এ শর্মা কিচ্ছুটি বিশ্বাস করে না। চুম্বক লাগিয়ে দেখে নিয়েছি। সাইজ খুব বড়ো না হলেও, মুখে-ভাত কি পৈতে-তে চালিয়ে দেওয়া যায়।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে জানলা দিয়ে একপলক দেখে নেয় সনাতন। —সোমনাথদা এসেছেন রে।

সোমনাথদা পেশায় অধ্যাপক, কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান। যদিও আমরা ওঁকে দাদা বলি, তা সত্ত্বেও সম্পর্কটা বন্ধুত্বের।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সোমনাথদা বললেন—বাইরে থেকে পঞ্চাননের গলা পেলাম যেন। তা সনাতন, এক রাউণ্ড চায়ের ব্যবস্থা কি হবে না? পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করেন সোমনাথদা। সঙ্গে কিছু বেগুনীও আনিস।

আমরা একসাথে বলে উঠি—সোমনাথদা যুগ যুগ জিও! এবার পাঁচুর ব্যাপারটা সলভ্ করুন দেখি? কুড়ি টাকায় স্টীলের থালা, বাটি, গেলাস, মায় চামচ শুদ্ধ দিচ্ছে!

কটা টিকিট বাকি?—সকৌতুকে পাঁচুর দিকে তাকান সোমনাথদা।

না, মানে……পাঁচুকে একটু বিব্রত মনে হয়। —ছুটো আছে।

আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাস করি—ব্যাপারটা কি সোমনাথদা? জোচ্চ্ রি নাকি?

—কেন? পাঁচু তোদের বলেনি? তা পঞ্চানন, তোমাকে টিকিটগুলো গছালো কে? দিদি না বৌদি?

রহস্যের গন্ধে আমরা সবাই সোমনাথদাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ি।

লজ্জিতমুখে পাঁচু বলল—মানে, এটা বৌদির ব্যাপার। বৌদির

এক বোন বৌদির কাছ থেকে কুড়িটা টাকা নিয়ে চারটে টিকিট গছিয়েছে। চারটের মধ্যে দুটো বিক্রির ভার আমার।

আর বাকি দুটো দাদার—পাশ থেকে এবার মন্তব্য করে ত্রিদিব।

এতে ঠকবার কিছু নেই।—সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে পাঁচু। আসল স্টীলের জিনিস, আর এটা ডাকযোগেও আসবে না। সরাসরি কলকাতার নামী দোকান থেকে আনতে হবে। কুড়ি টাকা প্লাস যাতায়াত বাবদ পাঁচ—মোটমাট পঁচিশ টাকা দিয়ে একশো টাকার জিনিস, তাহলে তিনগুণ লাভ নয়?

মাঝখানে বেগুনীর ঠোঙাটা নামিয়ে রাখে সনাতন।—মুখ চালাতে থাকুন, চা দিচ্ছে।

ত্রিদিব বলল—ব্যাপারটা কি সোমনাথদা? কুড়ি টাকায় একশো টাকার জিনিস কিনলে ঠকবো না তো?

গম্ভীরভাবে বেগুনীতে কামড় বসালেন সোমনাথদা, —না, ঠকবি কেন? জিনিসেও ভেজাল নেই। শুধু শর্ত হচ্ছে কুড়ি টাকার সঙ্গে চারটে কুপন কিনতে হবে, এবং সেই চারটে কুপন চার জনের কাছে বিক্রি করতে হবে।

পানু একটু ভেবে বলল—তাহলে দোকানীর কোন ক্ষতি হচ্ছে না? কুড়ি আর চার কুড়ি আশি—মোটমাট একশো টাকাই উঠে আসছে?

ত্রিদিব টেরছাভাবে তাকাল পাঁচুর দিকে। —বাকি টাকাটা তাহলে তুই আমাদের পকেট থেকে তুলতে চাস্?

পাঁচু ফোঁস করে ওঠে।—তুই-ও তো ঐ কুপনের বদলে চারটে কুপন পাবি। সেগুলো বিক্রি করে তুইও টাকা তোল না? কে আপত্তি করেছে?

হাত তুলে পাঁচু-ত্রিদিবকে থামান সোমনাথদা।—আসলে দোকানী একটা ছোট্ট চাল চেলেছে।

ঠোঙা থেকে বেগুনী তুলে নিতে নিতে ত্রিদিব বলল—কি রকম? কথা আছে না—তিল জমিয়ে তাল হয়। এখানেও ব্যাপারটা

তাই। মনে কর, দোকানী একজন খদ্দের পাকড়াও করলো। একজন থেকে চারজন, চারজন থেকে কুড়িজন, কুড়ি থেকে একশো, একশো থেকে পাঁচশো, তার থেকে আড়াই হাজার, তার পরে সাড়ে বারো হাজার –

পান্নু বলল – ব্যাস, ব্যাস। আর না। সোজা কথা, প্রতি রাউণ্ডে সংখ্যাটা পাঁচগুণ করে বেড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেককে চারটে করে কুপন বিক্রি করতে হচ্ছে যে!

সনাতনের হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা নিতে নিতে সোমনাথদা বললেন – দু-তিন রাউণ্ডের পর থেকেই চেনা পরিচিতির গণ্ডী ছাড়িয়ে চক্রটা ছড়িয়ে যায় এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধব মারফৎ। প্রতি রাউণ্ডের সংখ্যাগুলো পরপর যোগ করে দেখ, তেরো রাউণ্ডে পুরোপুরি 'নক-আউট', মানে গোটা দেশের জনসংখ্যা 'বাসন-কেনা' প্রকল্পের আওতায় চলে আসছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পান্নু বলল – বলেন কী?

– একেবারে খাঁটি সত্যি। এমন একটা সময় আসবে যখন কুপন গছানোর লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, ইতিমধ্যে তারা কুপন কিনে বসে আছে। ফলে তার কুড়িটা টাকাই নষ্ট। বাকি চারটে কুপন না গছাতে পারলে তো আর বাসন পাবে না? এভাবে হিসাব কষে দেখানো যায়, যতজন বাসন পেলো, তার চারগুণ সংখ্যক লোক বাসন পাবে না, অথচ তারা কুপন কিনে বাকি টাকার লোকসানটা পুষিয়ে দিচ্ছে!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ত্রিদিব বলল—যার মাথা থেকে বুদ্ধিটা বেরিয়েছিল, সে তো একজন পাকা অঙ্কের পণ্ডিত?

অন্য দিকটাও ভেবে দেখ—চায়ের ভাঁড়টা নামিয়ে রাখল পান্নু। বিনা পরিশ্রমে শ'য়ে শ'য়ে ক্যানভাসারও পাওয়া যাচ্ছে, যারা নিজেদের কুড়ি-টাকা তুলে নিতে অন্য চারজনকে এই চক্রে জড়াচ্ছে। লোভের ফাঁদে পা দিলেই হলো।

তাই তো বলছিলাম—আড্ডা ছেড়ে উঠে পড়লেন সোমনাথদা। মাইকেল মধুসূধন একটা বড্ডো দামী কথা বলে গিয়েছিলেন। "ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়........।" তবে পাঁচু, তুই আশা ছাড়িস না, কুপন দুটো কাউকে গছিয়ে দে। অবশ্য ক্লাবের কোন মেম্বারকে নয়। কাক কাকের মাংস খায় না।

ওজন বনাম আয়তন

গরমকালের ছুটির দিন। বাড়ী থেকে অর্ডার হয়েছে, একটা তরমুজ আনতে হবে। গরমের বিকেল—ছু-একজন আত্মীয় কুটুম আসবেন, একটু তরমুজের শরবত না হলে কি চলে ?

তরমুজের দাম বিস্তর, বয়ে আনা মুস্কিল –এ ধরণের ছু-একটা কথা পেড়েই বুঝলাম কথায় কথা বাড়ে।

সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষরা যা করেন, আমাকেও তাই করতে হলো, টাকা আর থলি হাতে রওনা দিলাম বাজারের দিকে। গরমের দিন, বাজারে তরমুজের অভাব নেই।

ফুটপাত জুড়ে 'তরমুজের ছুর্গ' তবে দামটা একটু চড়া এই যা।হ্যাঁ 'ছুর্গ' কথাটা চট করে মনে এলো কারণ গত ৬১-৬২ সালের কথা যাঁদের খেয়াল আছে তাঁরা নিশ্চয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বালির বস্তা দিয়ে তৈরী ছুর্গের কথা ভোলেন নি।

যাই হোক, কাছাকাছি এক তরমুজে তৈরী ছুর্গের কাছে গিয়ে দেখি, বেশ কিছু বাজার ফেরতা মানুষ তরমুজওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। মনে একটু খট্‌কা লাগল—এত লোক একসাথে তরমুজ কিনছে না কি ? কিন্তু না, দেখে তো মনে হচ্ছে সবাই যেন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে ! পায়ে পায়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে দেখি —আরে ! আমাদেরই ওপরের ফ্ল্যাটের ব্যানার্জীদা যে ! বক্তৃতার ঢঙে তরমুজওয়ালাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

ভদ্রলোক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, মানুষ হিসেবে যথেষ্ট রসিক তাও জানি, কিন্তু এখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন ? ভিড়ের ফাঁক থেকে চোখাচোখি হতেই ব্যানার্জীদা বললেন, চট করে মাঝখানটায় এগিয়ে এসো তো। তোমাকে পেয়ে ভালই হয়েছে, ব্যাটাকে সহজ হিসেবটা কিছুতেই বোঝাতে পারছি না !

আমি তো হতভম্ব। কিসের হিসেব ?

—আপনার হাতে ইঞ্চি-মাপার ফিতেই বা কেন ?

পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন আর এক ভদ্রলোক—আমাদের সরল মানুষ পেয়ে এরা যথেচ্ছ ঠকায়। আজ শক্ত-পাল্লায় পড়েছে।

সদর্পে দুটো তরমুজ তুলে ধরেন ব্যানার্জীদা—ব্যাপারটা বুঝুন মশাই। ওজনেও বিক্রি করবে না, আবার যা ইচ্ছে দামও চাইছে। ছোটটা আড়াই টাকা অথচ বড়টা বলছে, পৌনে চার! ··· নাও নাও আর একবার মেপে দেখিয়ে দাও!

আমি বললাম—তরমুজের আবার মাপ কী ?

—ঐ তো, ভুলটা করো ঐখানেই! ওজনে বিক্রি না করলে সাইজটা দেখতে হবে না ? এইদেখো ছোটটার বেড় মানে পরিধি হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার, আর বড়টার-ষাট। সগর্বে ফিতেটা পকেটে রাখেন ব্যানার্জীদাঃ তাহলে এবার দুটো তরমুজের পরিধির অনুপাতটা হিসেব করে দেখো। একটা পঞ্চাশ, অন্যটা ষাট, তাহলে অনুপাত দাঁড়াচ্ছে পাঁচ ঃ ছয় ? তাই তো ? তোমার কথায় ছোটটা আড়াই টাকা ধরলেও বড়টার দাম আসে তিন টাকা। অনুপাতের হিসেব তো তাই বলে ?

এতক্ষণে মুখ খোলে তরমুজওয়ালা ঃ ওসব অঙ্ক-টঙ্ক বুঝি না বাবু, তিনটাকা বার আনা ছ্যান।

ব্যানার্জীদা বললেন ঃ—অঙ্ক বোঝ না বলেই দেশের এই হাল হয়েছে! তিনটে টাকা আর দশটা পয়সা দিয়ে তরমুজ বগলে সগর্বে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসেন তিনি, পেছন পেছন ছোট তরমুজটা নিয়ে আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। ব্যানার্জীদা বললেন—বিকেলে শরবতের নেমন্তন্ন রইলো। আমি বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ব্যানার্জীদা ·······

আমাকে থামিয়ে ব্যানার্জীদা বললেন—চোপ! বিকেলে কথা হবে।

* * *

বিকেলে ধরলাম ব্যানার্জীদাকে। —মনে হচ্ছে আপনি, তরমুজওয়ালাকে ঠকিয়েছেন।

রহস্যের হাসি হাসলেন ব্যানার্জীদা—ওরা রোজ ঠকায়, আমি মাত্র একদিন ঠকিয়েছি।

পাশ থেকে বৌদি বললেন—তুমি ঠকিয়েছ? ব্যাপারটা কি-রকম হল?

আমি বললাম—যতদূর মনে হচ্ছে, পরিধির হিসেবে গণ্ডগোল হয়েছে। তাই তো?

মুচকি হেসে ব্যানার্জীদা বললেন—ছোট্ট একটা অঙ্কের মারপ্যাঁচ।

আমি এবং বউদি দুজনেই জিজ্ঞাসা করলাম— সেটা কি রকম?

—পরিধির অনুপাত যদি পাঁচ আর ছয় হয় তাহলে আয়তনের অনুপাতও তাই হয় না কি?

বউদি বললেন—ওসব অঙ্কের প্যাঁচ ছেড়ে সোজা কথায় বুঝিয়ে বল দেখি?

শরবতের গেলাসের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে ব্যানার্জীদা বললেন,—খুব সহজ অঙ্ক। তরমুজের বেড় মাপা অর্থাৎ একটা বৃত্তের পরিধি মাপা তাই তো? এখন অঙ্কের নিয়ম বলে যে কোন বৃত্তের পরিধির মান হল ২ × ব্যাসার্দ্ধ × পাই, অর্থাৎ ৩.১৪২।

একটা প্যাড আর কলম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্যানার্জীদা বললেন—ছোট তরমুজের পরিধি ৫০ সেন্টিমিটার আর বড়টার পরিধি ৬০ হলে চট্ করে তরমুজ দুটোর ব্যাসার্দ্ধ কত হবে বল দেখি?

অঙ্ক ব্যাপারটা ভাল না বুঝলেও ৫০ কে ৩.১৪২ × ২ অর্থাৎ ৬.২৮৪ দিয়ে ভাগ দিলাম।

বললাম—ছোটটার ব্যাসার্দ্ধ দাঁড়াচ্ছে ৭.৯৫৬৭ তাই তো?

ব্যানার্জীদা বললেন—আর বড়টার?

বৌদি বললেন—এখানেও একই হিসেব। ৫০ এর বদলে ৬০ কে ভাগ করতে হবে। ঠিক বললাম তো?

—একদম ঠিক। ব্যাসার্দ্ধ কতো দাঁড়াল?

—৯'৫৪৮০।

মুচকি হেসে ব্যানার্জীদা বললেন—এবার আর একটু কঠিন অঙ্ক কষতে হবে। ব্যাসার্দ্ধের হিসেব থেকে গোলক অর্থাৎ তরমুজের আয়তনটা বার করা। সোজা হিসেব—ফোর-থার্ড পাই আর কিউব!

বউদি বললেন—সেটা আবার কি?

অর্থাৎ ব্যাসার্দ্ধ × ব্যাসার্দ্ধ × ব্যাসার্দ্ধ × ৩·১৪২ × ৪/৩।

আমি বললাম—একটু সময় লাগবে, তবে হিসেবটা কষে ফেলছি। এই হিসেব ধরলে ছোট তরমুজের আয়তন ২১১০·২৭৪ ঘন সেন্টিমিটার আর বড়টার আয়তন দাঁড়াচ্ছে ৩৬৪৬·৫২ ঘন সেন্টিমিটার।

ব্যানার্জীদা বললেন—বড়টাকে ছোটটা দিয়ে ভাগ করলে আয়তনের অনুপাতটা বোঝা যাবে। অর্থাৎ···সংখ্যাটা হচ্ছে ১.৭৩।

বউদি বললেন—অত্যন্ত জটিল হিসেব। সব গুলিয়ে গেছে।

হাত নাড়লেন ব্যানার্জীদা। ঠিক আছে, অত অঙ্কের কচ্‌কচির মধ্যে না গিয়েও বলা যায় পরিধির অনুপাত পাঁচ : ছয় হলে তাদের আয়তনের অনুপাত হবে ছয় × ছয় × ছয়, তাকে ভাগ করতে হবে পাঁচ × পাঁচ × পাঁচ অর্থাৎ একশো পঁচিশ দিয়ে। এখানেও অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১'৭৩। তাই তো?

অল্প হেসে শরবতের গ্লাসে চুমুক দেন ব্যানার্জীদা।

—ছোটটার দাম আড়াই টাকা হলে বড়টার দাম হওয়া উচিত ১'৭৩ গুণ, অর্থাৎ চার টাকা বত্রিশ পয়সা। সেখানে তরমুজওয়ালা চেয়েছিল পৌনে চার টাকা, আমি দিয়েছি তিনটাকা দশ পয়সা। ভালই সওদা হয়েছে—কি বলো?

—কিন্তু কাজটা কি ভাল হল?

—ওজনে বেচলে এ ঝামেলা হত না। সাইজে বেচছিল বলেই তো মওকা পেয়ে গেলাম। ······ তাছাড়া গরমের মরশুমে তরমুজ আর কদিনই বা থাকে বলো?

কথা শেষ করে খালি গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখেন ব্যানার্জীদা।

সিকি-টাকা আধুলি

দোতলা বাসের ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটি। কাঁধে ব্যাগ, পায়ে চপ্পল, একটা হাত মুখের কাছে তুলে গলা খাঁকারি দিয়ে নিল। এই যে দাদারা........

দৃশ্যটা অপরিচিত নয়। পাশের সীটে বসা ভদ্রলোক বললেন—ধূপকাঠি।

—উঁহু। লজেন্স বা পেন মনে হচ্ছে। সামনের সীট থেকে সহাস্য মন্তব্য আর একজনের।

ছেলেটি তার বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। ···যত ভিড় বাড়ছে, বাড়ছে ছিনতাই আর পকেটমারের দৌরাত্ম্য। মা বোনেরা আজকাল আর গলায় সোনার হার পরে বাড়ির বাইরে যেতে সাহস পান না। কিন্তু মহিলারা গলায় কিছু দেবেন না—তা কি হয়? বাজারে এখন অনেক 'ইমিটেশন', কিন্তু তাদের আয়ু আর কতদিন? ক'দিন পরেই রং জ্বলে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে তা সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু না, এখনো কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায়। সন্তর্পণে সাইড ব্যাগটি খুলল ছেলেটি। আমরা কয়েকজন বাঙালী ছেলে মিলে এই ইমিটেশন হারের ব্যবসা শুরু করেছি। দাম··· ।

সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বোঝা গেল এ হার যে ধাতু দিয়ে তৈরী, তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, ফলে তার ওপর লাগানো রঙ জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই মোটেই। দু বছরের পাকা গ্যারান্টি!

সামনের সীটের মোটাসোটা এক ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে ছেলেটির কথা শুনছিলেন। থামতেই প্রশ্ন করলেন—খাঁটি ধাতু পাচ্ছ কোথা থেকে ভাই?

—গর্বের হাসি ফুটে ওঠে ছেলেটির মুখে। একেবারে সরকারি জিনিস স্যার। খুচরো পয়সা গলিয়ে যে মেটাল্—

ব্যাস! এই কথাতেই বাসের মধ্যে বোমা ফাটল যেন। —আচ্ছা,

এ সব তাহলে তোমাদের কীর্তি? আমরা মরছি খুচরো সমস্যায়. আর তোমরা কি না…। দু-একজন চাঁদা করে চাঁটি মারার প্রস্তাব তুলতেই ভিড়ের ফাঁকে গলে চট্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় ছেলেটি। নাঃ—কথাটা বড় বেফাঁস বলা হয়ে গেছে।

রোজ যাঁদের ট্রামে-বাসে চড়তে হয় বা নিত্য থলি হাতে বাজারে যেতে হয়—তাঁদেরকে বলে দিতে হবে না এই 'খুচরো' সমস্যা যে কি বিড়ম্বনা! বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে ডাকঘরে খুচরোর অভাবে এখন এন্তার স্ট্যাম্প-পোষ্টকার্ড কিনতে হচ্ছে প্রায়ই, বাসে খুচরো দিতে না পারলে টাকার ফেরত আসে 'কুপনে'।

বাজারে আলু পটল কিনতে হয় গোটা টাকায় বা তার গুণিতকে। আর সেই গল্পটা তো এখন মুখে মুখে শোনা যায়—"মিনিবাসে পুরো ভাড়া খুচরো পয়সায় দিতে না পারায় ভদ্রলোককে ডালহৌসীতে না নামিয়ে নাকি কণ্ডাকটার সিধে তিম মাইল পার করে নামিয়েছিল! পুরো টাকাটা উশুল করতে হবে তো?"

না, কোনটাই অতিশয়োক্তি নয়—বাজারে এখন খুচরোর হা-কাল। হাতে হাতে ঘুরছে রঙ উঠে বিবর্ণ আধ ছেঁড়া টাকার নোট কিংবা বিকল্প হিসেবে চকচকে ধাতুর 'কয়েন' মানে 'টঙ্কা'! খুচরোর এই অভাব দেখা দিয়েছিল তিরাশী সালের গোড়ার দিকে, বিশেষজ্ঞদের ধারণা—সাতাশীর আগে এই সঙ্কট মেটার আশা নেই। কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টি হ'ল কি ভাবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বিরাশী সালে, যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ থেকে দেশে খুচরো পয়সার অবস্থা ও উৎপাদন নিয়ে এক সমীক্ষা চালান হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, সারা দেশে খুচরো তৈরীর 'টাঁকশাল' আছে মাত্র তিনটি, কলকাতা, বোম্বাই এবং হায়দ্রাবাদে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার সমীক্ষায় জানায় যে সারাদেশে খুচরো পয়সার কোন অভাব নেই, উৎপাদনও প্রচুর। সুতরাং একটি ইউনিট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হোক!

এ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি, তবে তিনটি ছাপাখানাতেই কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তের ফল মিলল প্রায় হাতে হাতেই। একবছরের মধ্যে খুচরোর চাহিদা আর উৎপাদনের মধ্যে ফারাকটা গেল বেড়ে, ফলে বাজারে খুচরোর পরিমাণও কমতে শুরু হলো দ্রুতগতিতে।

৮২-৮৩'র রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানালেন যে তাঁদের আগের সমীক্ষা ভুল ছিল। তার আগেই সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এক এবং দু-পয়সার উৎপাদন কমানো হবে এবং জনসাধারণের চাহিদার কথা ভেবে বাড়তি দু-টাকার নোট ছাড়া হবে বাজারে। মনে রাখতে হবে—এ সব কাজেরই ভার কিন্তু ঐ তিনটি ছাপাখানার ওপর। একদিকে নোট ছাপানোর তাগিদা, অন্য দিকে কম খুচরো তৈরীর সিদ্ধান্ত, সব মিলিয়ে খুচরো সমস্যা ক্রমেই বিরাট আকার নিতে শুরু করলো। যদিও সরকারী তরফে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো আবার খুচরো তৈরীর দিকে নজর দেওয়ার, কিন্তু সীমিত যন্ত্রপাতি এবং কর্মী দিয়ে এ সমস্যা মিটবে কি ভাবে? পাশাপাশি রিপোর্ট আসতে থাকে যে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজার থেকে খুচরো সরিয়ে 'বাট্টার' লোভে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছে, পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর মানুষ খুচরো পয়সা গালিয়ে তা থেকে ধাতু বের করে পয়সার তুলনায় বেশী লাভ করছে ধাতু বিক্রি করে। এ-সবের নীট ফল আমরা দেখছি যে পাঁচ দশ বিশ পয়সা যত বাজারে চলছে, তার থেকে ঢের বেশী চলছে সিকি-আধুলি আর কাঁচা টাকা।

কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে? এই হাতে হাতে অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচ-দশ পয়সার বদলে সিকি-আধুলি ঘোরা? না না, এধরণের প্রশ্ন করে টাকার দাম কমছে কি কমছে না, এধরণের কোন বিতর্কের অবতারণা করার কোন সিদ্ধান্তই আমার নেই। বরং বলা যেতে পারে, এই প্রশ্নটা আমাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন মার্কিন মুলুক ফিলাডেল-ফিয়ার বাসিন্দা উইলিয়াম স্যাণ্ডারম্যান। না, ভদ্রলোক অর্থনীতিবিদ নন, পেশায় ইনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। না এটা কোন হেঁয়ালি নয়,

মার্কিন মুলুকের 'পাঁচ-সেন্ট' মুদ্রায় যেমন নিকেলের ভাগ বেশী, আমাদের দেশে সিকি-আধুলির ক্ষেত্রেও তাই—ধাতুর মধ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগই নিকেল। বিজ্ঞানীদের মতে এই নিকেল বস্তুটি বিশেষ সুবিধের নয়—উল্টে ক্ষতিই করে বেশী। গরমের দিনে হাতের তালু ঘামতেই পারে, ঘামের নুন আর জলের সঙ্গে মিশে নিকেল এসে জমে হাতের চেটোয়। আর হাত থেকে মুখের মাধ্যমে তা পেটে যেতে সময় লাগে কতটুকু ?

নিকেল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নিশ্চয়—কারণ আজ এটা প্রমাণিত যে সিগারেট থেকে ফুসফুসে ক্যানসার হওয়ার মূলে আছে এই নিকেল। তামাকের মধ্যে সামান্য পরিমাণে থাকে যে নিকেল, তা পুড়ে তৈরী হয় 'নিকেল-কার্বোনিল' গ্যাস ; যা কিনা ফুসফুসের ক্ষতি করে সরাসরি। কেউ হয়তো ভাবছেন—সিগারেট না খেলেই তো হলো ? আর টাকা-পয়সার ছোঁয়াছুঁয়ি কতটুকুই বা বিপদ আসতে পারে ? কিন্তু না, শুধু সিকি-আধুলিই নয়, বিপদ আসতে পারে অন্য সূত্রেও। ঘরের মা-লক্ষ্মীদের কল্যাণে ঘরে ঘরে স্টেনলেস স্টীলের আসর এখন জমজমাট এবং হ্যাঁ, স্টেনলেস স্টীলেও অন্ততঃ শতকরা আটভাগ নিকেল থাকেই। সুতরাং নিকেলকে এড়ান শক্ত।

এবার বরং টাকা পয়সা ছোঁয়াছুঁয়ির প্রসঙ্গে একটু চিন্তা করা যাক। হাতের ঘামের সঙ্গে নিকেল মিশে মুখের মারফত পেটে যেতে পারে ঠিকই। কিন্তু মুখে হাত না দিলেই তো হয় ? এখানেও বাদ সেধেছেন ডাক্তার স্যাণ্ডারম্যান। সমীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব লোক চর্মরোগে ভোগেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা পাঁচ থেকে দশজনের এইসব চুলকানি বা একজিমার পেছনে মুদ্রার থেকে আসা নিকেলের স্পর্শ। আমাদের দেশে যদিও এরকম সমীক্ষা এখনও করে দেখা হয়নি, কিন্তু তা হলেও ফল বোধহয় দেখা যেত একই রকম। সিকি-আধুলির ঘাড়ে দোষের বোঝা বাড়তো বই কমতো না।

এছাড়া অন্য অসুবিধেও বোধহয় আছে, শুধুমাত্র ভাগ্যবানের নয়, বহু অভাগারও টাকা আধুলির ভারে পকেট ছিঁড়ে যাবার ঘটনা

আজ মোটেই বিরল নয়। তাছাড়া পাঁচ দশ পয়সার মতো সিকি আধুলি হাতে হাতে ঘোরায় এদের মারফত রোগ সংক্রমণের ঘটনাও বাড়বে, বিশেষতঃ চোখ, নাক বা গলার রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ। কয়েক বছর আগেকার সেই ব্যাপক 'কনজাংটিভাইটিস'-এর ঘটনার পিছনে হাতে হাতে খুচরো পয়সা ঘোরার যে একটা বিশেষ অবদান ছিল, তা অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন।

অবশ্য ধাতুমুদ্রার পক্ষে বলার মতও কিছু যে নেই তা নয়। কাগজের টাকার মতো ছিঁড়ে যাওয়া বা জলে ভিজে কালি-ধ্যাবড়ানোর বিপদ এতে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষের সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবেই 'কাগজের টাকা' থেকে ধাতুমুদ্রার দিকে ফিরে যাবার কোন যুক্তিই ধোপে টিঁকবে না। অতঃ কিম? অন্য উপায় কি থাকতে পারে? সমাধানও আমাদের সামনে আছে, হাল আমলে পাঁচ-দশ বা বিশ পয়সার যে অ্যালুমিনিয়ামের মুদ্রা বাজারে চলছে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থেকে এখনো তা মুক্ত। বিশেষতঃ নিকেল-ঘটিত সমস্যা থেকে তো বটেই! তাছাড়া ওজনের ভারও এতে কম।

আশার কথা এই যে, নিকেল ঘটিত সাবেকী পয়সার বদলে নতুন অ্যালুমিনিয়ামের পয়সা তৈরী করার জন্যে নতুনভাবে সরকারী চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। বেশ কিছু নতুন ও আধুনিক-মেশিন বসানো হয়েছে দেশের তিনটি ছাপাখানায়। তাছাড়া খুচরো-সংক্রান্ত সমস্যার কথা ভেবেও চতুর্থ একটি 'টাঁকশাল' তৈরীর কাজ চলেছে উত্তর প্রদেশের 'নাইদা'য়। আশা করা যায় এটি একদিকে যেমন খুচরো-সঙ্কট মোকাবিলার পক্ষে সহায়ক হবে, তেমনি সহায়ক হবে নিকেল ঘটিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেও। কিছু লোক হয়তো সেদিনও অখুশী হবেন—অ্যালুমিনিয়ামের পয়সা গালিয়ে যে ধাতু পাওয়া যাবে, তা দিয়ে তৈরী গয়না কেউ ব্যবহার করবে কি?

অক্টোবর বিপ্লব ঃ ২৬শে অক্টোবর না ৭ই নভেম্বর ?

যাঁরা ইতিহাস ভালবাসেন, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—১৯১৭ সালটা কোন ঘটনার জন্যে বিখ্যাত মনে পড়ে কি ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাব জানি, রাশিয়ার বলশেভিক অভ্যুত্থান, যার অন্য নাম অক্টোবর-বিপ্লব।

এবার যদি প্রশ্ন রাখি—ঐ অক্টোবর বিপ্লবের স্মরণে কোন দিন পালন করা হয় ?

এইবার কিন্তু অনেকেই চিন্তা করতে শুরু করবেন, কারণ সারা রাশিয়ায় ৭ই নভেম্বর দিনটা পালন করা হয় অক্টোবর বিপ্লব স্মরণ দিবস হিসেবে।

ব্যাপারটা বোধহয় গণ্ডগোলের ঠেকছে ? সত্যিই তাই—গণ্ডগোল একটা আছে ঠিকই, তবে তা ইতিহাসের নয়। গোড়ায় গলদ বাঁধিয়েছে ক্যালেণ্ডার।

অবশ্য গলদটা যে ঠিক কোথায়, তা বুঝতে গেলে আমাদের সময় ধরে পিছিয়ে যেতে হবে সেই খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার সালে, যখন আমাদের এই পরিচিত ক্যালেণ্ডারের প্রথম সংস্করণের জন্ম। শুনে মজা লাগছে নিশ্চয়—দেওয়ালে ঝোলান রঙচঙে ক্যালেণ্ডার, তারও জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার মানে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ?

হ্যাঁ—শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি যে সেইযুগেও মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন বা গ্রীসের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সময়ের পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা ছিল নিখুঁত। সময় বোঝার জন্য ক্যালেণ্ডারের ভাবনা তাঁদেরই। তবে সে সময়ের ক্যালেণ্ডার ছিল চান্দ্র ক্যালেণ্ডার, আজকের দিনের সৌর ক্যালেণ্ডার নয় !

আবার গোলমালে ফেলে দিলাম তো ? দাঁড়ান, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি। ক্যালেণ্ডার কিসের হিসেব রাখে ?

অবশ্যই সময়ের, কিংবা আরো সোজা কথায়—দিনের হিসেব। এবার চিন্তা করা যাক্ দিন বলতে কি বোঝায়! আমরা জানি নিজের অক্ষের ওপর একবার পাক খেতে পৃথিবীর যতটা সময় লাগে, তাই হল দিনের হিসেব। অঙ্কের ভাষায় বললে বলতে হয় নিজের অক্ষের ওপর ৩৬০ ডিগ্রী পাক খাওয়া।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর পাক খাচ্ছে তা তো বোঝা গেল। কিন্তু এই যে পাক, তার শুরুই বা কোথায়, কোথায় বা তার শেষ? হিসেবটা প্রায় সেই মেরি-গো-রাউণ্ডের হিসেবের মতো—টিকিট বিক্রি করছে যে লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, তার সামনে সাদা ঘোড়াটা ঘুরে এলে এক পাক, পরের বার দু পাক—এই রকম হিসেব! পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর সূর্যের সাপেক্ষে পাক খাবার হিসেবটা হল সৌরদিনের হিসেব। অবশ্য পৃথিবী যে শুধু নিজের অক্ষের ওপর পাক খাচ্ছে তা তো শুধু নয়, সূর্যকেও সে একটা উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে, যে সময় পৃথিবীর লাগছে তা হল একবছর বা সৌরদিনের হিসেবে ৩৬৫ দিনের একটু বেশী, প্রায় ৩৬৫¼ দিন! আসলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই মাপটা ঠিক করেছেন 'ভার্নিক্স ইকুইনক্স' ধরে, অর্থাৎ ২০শে মার্চ, যেদিন রাত আর দিনের মাপ সমান!

মাসের হিসেবটা কিন্তু একটু গোলমেলে। পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাচ্ছে চাঁদ, একবার পাক খেতে যার সময় লাগছে ২৭·৩২ সৌরদিন বা একমাস। এখানেও চাঁদের চলার শুরু আর শেষ হবে সূর্য্যের সাপেক্ষে, অর্থাৎ যে মুহূর্তে চাঁদ, পৃথিবী আর সূর্য এক সরলরেখায় আসবে, সেখান থেকে চলার শুরু, আবার ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে এসে ফের সেই অবস্থায় এলে একটা পাক পুরো হবে।

আসল গণ্ডগোলটা কিন্তু এইখানেই। চাঁদ, পৃথিবী আর সূর্য এক রেখায় এল—অর্থাৎ পূর্ণিমা। পূর্ণিমা থেকে চাঁদের চলা শুরু, হিসেব মতো ফের পূর্ণিমা এলে তার পুরো পাক মানে ৩৬০ ডিগ্রী ঘোরা শেষ হবে। কিন্তু পৃথিবী তো আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই,

তারও বার্ষিক গতি, মানে সূর্যকে পাক খাওয়ার ব্যাপার আছে। ফলে চাঁদ যখন ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে এল, তখন দেখা গেল চাঁদের সাপেক্ষে পৃথিবী খানিকটা এগিয়ে গেছে, মানে চাঁদের দৌড়ের 'স্টার্টিং পয়েন্ট', নিজেই খানিকটা এগিয়ে গেছে। ফলে প্রতি মাসেই চাঁদকে ঠকিয়ে পৃথিবী কয়েটা ডিগ্রী বেশী পাক খাইয়ে নিচ্ছে। একপাক পুরো হবার সময়টা অর্থাৎ পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা—এই সময়টা আসতে লাগছে মোটামুটি ২৯.৫ দিন।

এবার চিন্তা করুন, ক্যালেণ্ডারের বারোটা মাসে একটা বছর—যার মধ্যে মাসের হিসেবটা ঠিক হবে চাঁদকে দেখে, আর বছরের হিসেব, সূর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। গণ্ডগোলের সূত্রপাতও সেইখানে। সাড়ে উনত্রিশ দিনে যদি মাস হয়, আর বছরে যদি বারোটা মাস থাকে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? তিনশো চুয়ান্ন দিনেই বছর শেষ! তাহলে বাকি এগারোটা দিন যাবে কোথায়?

ব্যাবিলোনীয় পণ্ডিতরা বললেন—চিন্তার কিছু নেই, বছরের শেষে এগারো দিনের একটা পুঁচকে মাস জুড়ে দিলেই হল। অবশ্য জুড়তে হবে একটু কায়দা করে, ক্যালেণ্ডার তৈরীর শুরু থেকে ৭, ২৬, ৪৫, ৬৪ —এইসব বছরগুলোতে মাসটা লাগিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ উনিশ বছরের একটা বর্ষচক্র কল্পনা করে তার প্রতি সপ্তম বছরে এটা থাকবে। এতে সুবিধে হচ্ছে এই যে এ কায়দায় বছরের গড় মাপটা প্রায় ৩৬৫.২৫ সৌরদিনে চলে আসছে।

এই পদ্ধতিটা সেই সময় প্রায় সকলেরই মনে ধরলো। সামান্য অদলবদল করে মেসোপটেমিয়া বা গ্রীসেও বছর গোনার এটাই হল সেই সময়ের হিসেব। এই হিসেব আজও চালু আছে, তবে ইংরেজী-মতের ক্যালেণ্ডারে নয়, ইসলামী মতে। কিন্তু এই ক্যালেণ্ডারে একটা অসুবিধে আছে, সকলেই লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—উৎসবের দিনগুলো ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের নির্দিষ্ট দিনের সঙ্গে মেলে না; ইংরেজী মতে, বছর বছর ইসলামিক্ উৎসবের দিনগুলো পাল্টায়। যেমন, ধরা যাক ১৯৮১ তে, অর্থাৎ ইসলামিক ১৪০২ সালে নববর্ষ

ছিল ইংরেজী ৩০ অক্টোবর, পরের বছর – মানে ১৪০৩ সালের নববর্ষ এল ইংরেজী মতে ১৯৮২ সালের ১৯অক্টোবর। ঠিক এই অসুবিধে দেখা দিয়েছিল প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ক্যালেণ্ডারেও, বছরের বিশেষ বিশেষ দিন, যেমন, যেদিন দিন-রাতের মাপ সমান অথবা সব থেকে ছোট বা সব থেকে বড় দিন, তাদের হিসেবও বছর বছর পাল্টাতে লাগল।

চান্দ্রমাসের হিসেব থেকে পুরোপুরি সৌরমাসের হিসেব চালু করার বুদ্ধিটা আসে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬ সালে। বুদ্ধিটা বেরিয়েছিল রোমের সম্রাট জুলিয়াস সীজারের মাথা থেকে। সীজার বুদ্ধি দিলেন বারোটা মাসের মধ্যে কতকগুলো ৩০ দিনে আর বাকিগুলো ৩১ দিনে চিহ্নিত হোক। ফেব্রুয়ারী মাস হবে ২৮ দিনে। এই হিসেবে বছরের মাপ দাঁড়াল ৩৬৫ দিনে। কিন্তু বাকি রইল যে ০·২৫ দিন, মানে ৬ ঘন্টা?

সীজার বললেন,—এ হিসেবও মেলান সম্ভব। প্রতি চারবছরে একদিন জুড়তে হবে ফেব্রুয়ারী মাসে। সে বছরের নাম হবে 'লিপ-ইয়ার'। সীজারের নামে সাধুবাদ পড়ল প্রচুর। ক্যালেণ্ডার চালু হয়ে গেল—চললও বেশ কয়েকশো বছর।

এদিকে বিজ্ঞান যত এগোতে লাগল, বাড়তে শুরু করল জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের চিন্তা ভাবনাও। তাঁরা দেখলেন ৩৬৫·২৫, এই গড় হিসেবে বছরের মাপ ধরলেও একটু অসুবিধা থেকেই যাচ্ছে। নিজের অক্ষের ওপর একটু হেলে পাক খাচ্ছে পৃথিবী, একবার সূর্যকে পাক পুরো করতে তার সময় লাগছে সঠিক ভাবে ৩৬৫·২৪২১৯৮৭৯ দিন, অর্থাৎ ৩৬৫·২৫ দিনের থেকে সামান্য কম! এর ফলে দেখা গেল—সীজারের পদ্ধতি ধরে হিসেব করলে প্রতি ১২৮ বছরে 'ভার্নিক্স-ইকুইনক্স' অর্থাৎ যে দিনটায় রাত আর দিন সমান—তা সরে যায় ২৪ ঘন্টা! সীজারের সময় থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত—দেখা গেল সময় সরতে সরতে 'ভার্নিক্স ইকুইনক্স' ১৩ দিন সরে এসেছে। সেই সময় এই বিপত্তি দূর করতে নতুন করে ক্যালেণ্ডার তৈরী করতে দেওয়া হয়, 'ক্লেভিয়াস' নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে।

ক্লেভিয়াস দেখলেন প্রতি চারশো বছরে একবার যদি তিনটে

দিন বাদ দেওয়া যায় তাহলে বছরের গড় দিনসংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩৬৫·২৪২ তে। তিনি বললেন, শতাব্দীর শুরু বছরগুলো, অর্থাৎ ১৬০০, ১৭০০, ১৮০০, এই সব বছরগুলোর মধ্যে যে সব সংখ্যাকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করা যাবে, সেইগুলোই শুধু 'লিপ-ইয়ার' হবে, অন্যগুলো নয়। অর্থাৎ এই নিয়মে ১৬০০, ২০০০ বা ২৪০০ – এই সব সংখ্যার বছরগুলো লিপ-ইয়ার, কিন্তু ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ বা ২১০০—এগুলো নয়।

ক্লেভিয়াসের প্রস্তাবকে চালু করার নির্দেশ দেন ত্রয়োদশ পোপ—গ্রেগরী, সালটা ছিল ১৫৮২। সেই থেকে ক্যালেণ্ডারের নাম হল 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার' যার থেকেই আমাদের আজকের ক্যালেণ্ডার এসেছে। কিন্তু ক্যাথলিক পোপ যা নির্দেশ দিলেন, অন্য ধর্মযাজকরা তা মানবেন কেন? সীজারের ক্যালেণ্ডার আঁকড়ে ধরে তাঁরা চলতে লাগলেন, এ ব্যাপারটা চলল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। শেষে বৃটেনের আর্ল অফ চেষ্টারফিলড্ বহু তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বৃটেনে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের প্রচলন করেন ১৭৫১ সালে। সেই সময় দেখা গেল সীজারের ক্যালেণ্ডার আর নতুন গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের মধ্যে 'ভার্ণিক্স-ইকুইনক্সের' তফাৎ ১১ দিনের।

সুতরাং সেই সময় ঠিক হল, দিনের হিসেব ১১ দিন এগিয়ে যেতে হবে, ১৭৫২ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের পরের দিনটা হবে ১৪ই সেপ্টেম্বর! এ নিয়ে অবশ্য বিস্তর গণ্ডগোল হয়েছিল—বাড়ীভাড়া বিল, ট্যাক্স, হিসেবপত্রে নানা নতুন নিয়ম করে অবস্থাটা সামাল দিতে হয় সে যাত্রায়! রাশিয়াতে এ নিয়ম চালু হয় আরো পরে—অর্থাৎ বলশেভিক বিপ্লব ঘটে যাবার পর।

সুতরাং—যে কথা গোড়াতেই বলেছি, অক্টোবর বিপ্লবের সময়টা অক্টোবর মাসে ছিল ঠিকই, ২৬ শে অক্টোবর। কিন্তু নতুন নিয়মের ক্যালেণ্ডার চালু হবার পরে ২৬ শে অক্টোবর দিনটা এগিয়ে এসে হল ৭ই নভেম্বর! —রহস্যটা এবার পরিষ্কার হল তো?

অবশ্য এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে বার কয়েক, কিন্তু নানা বিপত্তির কথা ভেবে বিজ্ঞানীদের আর এগোনোর উৎসাহ থাকেনি।

ক্রিকেট মাঠের গণৎকার

গত ৮৪—'৮৫ মরশুমে ভারত ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট টেস্টের সময়-কার কথা। ৩১ ডিসেম্বর—ব্যাট-বলের লড়াই জমেছে ইডেনে। ব্যাট করতে নেমেছে ভারত, ফাস্ট বোলিং-এ আক্রমণ শানাচ্ছে ইংল্যাণ্ড। গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছি, হঠাৎ পাশ থেকে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বলে উঠলেন—এবারের টেস্ট 'ড্র' হচ্ছে! ভাল করে তাকিয়ে দেখি, পরিচিত মানুষ, বেসরকারি কলেজে ফিজিক্স পড়ান। চোখে চোখ পড়তেই হাসলেন—আজ আর 'লাঞ্চের' আগে উইকেট পড়ছে না, সারাদিনেও পড়বে কিনা সন্দেহ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্য কানে এল—ইনি 'ত দেখছি ক্রিকেট মাঠের গণৎকার। ......মশাই, ক্রিকেট ইজ দি গেম অফ গ্রেট আনসার্টেনটি। যত্তো সব!

শুনতে বেশ মজা লাগছিল। গোটা দেশের মানুষ যখন রেডিও-টেলিভিশনে জানতে উদ্‌গ্রীব গাওয়ার-গাওস্করের দলগত লড়াই ইডেনে কোনদিকে মোড় নেয়, তখন এইভাবে উত্তেজনার আগুনে জল ঢালার কোন মানে হয়! ভদ্রলোক বোধহয় আমার মনের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন—মুচকি হেসে বললেন, পাঁজিতে তাই লেখা আছে।

—পাঁজিতে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎবাণী?

—আরে দূর মশাই, ক্রিকেটের নয়, জোয়ার-ভাঁটার হিসেব।

—জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে উইকেট পড়া-না-পড়ার কি সম্পর্ক?

—আছে আছে। অল্প হেসে অধ্যাপকমশাই জলপানের বিরতির সময় বিস্তারিতভাবে তাঁর মতামতের পেছনের কার্য-কারণ সম্পর্কটা বলেছিলেন।

বিশ্বাস করুন আর না করুন, সেদিন সারাদিনে একটাও উইকেট পড়েনি, সেবার কলকাতা টেস্ট ড্র-ই হয়েছিল !!

*　　　*　　　*

পদার্থ বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরা কিন্তু সেবার অনায়াসেই ভবিষ্যতবাণী করতে পারতেন, ইডেনে ঐ খেলায় ফাস্ট বোলাররা বিশেষ স্থবিধে করতে পারবেন না, স্থতরাং খেলা ড্র হবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। না, কোন জ্যোতিষের ব্যাপার নয়। খেলা-ধুলোয় উৎসাহী মানুষ মাত্রেই জানেন ফাস্ট-বোলারদের প্রধান অস্ত্র—বলের স্থইং। অর্থাৎ, সেলাই-র ওপর পড়ে লাফিয়ে ওঠার সময় বলটা সোজা না গিয়ে ডাইনে বা বাঁয়ে বাঁক নেবে বাতাসে। বলের গতিতে এই যে বাঁক, সেটা কতখানি বাড়তি পাওয়া যাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। '৮৫-র প্রথম সপ্তাহে অবস্থাটা বোলারদের পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। একটানা বৃষ্টি না হওয়া বা স্বল্প-মাত্রায় শিশির পড়ার দরুণ সকালে আর্দ্রতা ছিল কম, ফলে বলের সেলাই জল টানতে পারেনি, আর জল টেনে ফুলে ওঠেনি বলেই পীচ খাওয়ার পর বলে বাড়তি গতি বা বাঁক কোনটাই আসেনি।

শুধু আর্দ্রতাই নয়, যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা যদি না থাকে এবং আকাশে মেঘ না থাকলে বোলারদের হতাশ হতে হবে। কারণটা আর কিছুই নয়, বাতাস ঠাণ্ডা হলে তার ঘনত্ব বাড়ে, বাড়ে স্থইং-এর পরিমাণও। ফলে সেসব ক্ষেত্রে বাড়তি গতি বা স্থইং-এর জন্য বোলারদের কপালের ঘামই ভরসা! হ্যাঁ, ঘামের তেলতেলে ভাব বলের গা মসৃণ রাখে, বল বাতাস কাটে চটপট্, আরো দ্রুত। এর ওপর বাতাসের সহায়তা পেলে 'ত কথাই নেই। তবে বলের এই মসৃণতা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় হামেশাই নানা কুবুদ্ধি মাথা চাড়া দেয় কোন কোন বোলারের, এবং তাই নিয়ে লাগে নানা বিরোধ।

সত্তরের দশকে এমনি এক ঘটনাকে ঘিরে ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার বিরোধ উঠেছিল তুঙ্গে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্টে অষ্ট্রেলিয়ার বব ম্যাসি পেলেন ষোলটি উইকেট, লর্ডসের মাঠে। পত্র-পত্রিকাগুলো ম্যাসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও নিন্দায় সোচ্চার হলেন ইংল্যাণ্ডের দুই

খেলোয়াড়–স্নো এবং ইলিংওয়ার্থ। তাঁরা বললেন, ম্যাসি অবৈধভাবে বলের গায়ে ভেসলিন মাখিয়েছে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানদের চোখ এড়িয়ে। অথচ এই ইংল্যাণ্ড দলই নাকি একই কায়দা নিয়েছিল ৭৬-'৭৭ মরশুমে, ইংল্যাণ্ডে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায়। বিতর্কিত বোলারটি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের জন লেভার। লেভারের ভ্রূ খুবই চওড়া, সেখানে ঘাম জমে তা গড়িয়ে নামে চোখের পাতায়। ঘাম আটকাতে লেভার তাই ভ্রূ-র ওপর আটকান 'সোয়েট-ব্যাণ্ড'। সোয়েট ব্যাণ্ডের নীচের দিকে থাকে ভেসলিনের আস্তরণ, না হলে তা ভ্রূ-র ওপর আটকাবে কেন? ছুটোছুটি দৌড় ঝাঁপের সময় এই 'ব্যাণ্ড' একটু নেমে আসতেই পারে, তাকে হাত দিয়ে তুলে দিতে হয় যথাস্থানে। এই ফাঁকেই কিন্তু 'ব্যাণ্ড' থেকে ভেসলিন চলে আসে হাতে, হাত থেকে বলের গায়ে। ভেসলিনের একটা বড় গুণ হল– এটা বলের মসৃণতা বাড়ায়, ফলে বল বাতাসে কম ঘর্ষণজনিত বাধার সম্মুখীন হয়, বাতাস কাটে চটপট, বলের গতি যায় বেড়ে। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায়—থম'স এফেক্ট। ভারতের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিস্তর, কিন্তু বলাই বাহুল্য কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কান দেননি মোটেই

যাই হোক, ১৯৮৪'-৮৫-র খেলার কথায় ফিরে আসি বরং। সেবার ভারতীয় দলকে আশ্চর্যভাবে সাহায্য করেছিল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা—গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা। না, আশ্চর্য হবার কিছু নেই! মাটির নিচে গঙ্গার জল চুঁইয়ে উঠে আসে ইডেনে! এবং মাঠের পীচে কতটা 'ভিজে ভাব' উঠবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে জোয়ার-ভাঁটার ওপর। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সেবার খেলার প্রথম দিনে, অর্থাৎ '৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর গঙ্গায় ভাঁটা-শুরু হয়েছিল সকাল ৯-২৯ মিনিট থেকে। খেলা শুরুর ঠিক মুখেই মাটির নিচে জলের টান কমে যাওয়ায় ওপরের মাটির ভিজে-ভাবও যায় চলে, ফলে পীচ থেকে ফাস্ট বোলাররা কোন সুবিধেই পাননি। অথচ সেদিন সকাল সাড়ে ন'টায় গঙ্গায় যদি ভাঁটার বদলে জোয়ার খেলত, ফলটা ব্যাটধারীদের

পক্ষে হত মারাত্মক। মাটির নিচে জলীয় ভাব বেশি, তার ওপর কড়া সূর্য্যের তাপ। মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসত পীচের ওপর। মাটির ওপর ফুট-খানেক ভিজে বাতাস, সুইং করানর পক্ষে একেবারে আদর্শ। যাঁরা অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, তাঁদের অনেকেরই হয়ত পীচের এই আচরণ চোখে পড়েছে! শুধু ইডেনই নয়, যে সব মাঠ সমুদ্রের কাছাকাছি বা পাশেই নদী আছে, সেখানেই এই নীতি ঘটবে। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক টেড ডেক্সটার তাঁর আত্মজীবনীতেও এক জায়গায় লিখেছেন—কোন কোন মাঠে বলের আচরণ বড় বিচিত্র। দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা সেখানে বল বাতাসে অবিশ্বাস্য রকম বাঁক নেয়, আবার অন্যসময় পীচ একেবারে প্রাণহীন! ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বারবাডোস ক্রিকেট মাঠের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ডেক্সটার। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এই মাঠগুলোও সমুদ্রের খুব কাছেই। সুতরাং জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে বলের সুইং-এর সম্পর্কটা যে যথেষ্ট নিবিড় তাতে সন্দেহ কি?

* * *

খেলার মাঠে অধ্যাপকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অধ্যাপকের কথা দিয়ে শেষ করি। ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্য শেষ করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—অভিজ্ঞ-অধিনায়ক যাঁরা, তাঁরা টসে নামার আগে যেমন পীচ, বাতাসের গতি, আর্দ্রতা, মেঘ-রোদ্দুর এসব যেমন দেখেন তেমনি একবার পাঁজিটাও দেখে নিন না—অর্থাৎ জোয়ার-ভাঁটর সময়টা। অন্যত্র না হলেও ইডেনে তো বটেই।

মূল্যবান পরামর্শ—সন্দেহ নেই!

বল-বদল

গত ১৯৮৪'৮৫ মরশুমে ভারত ইংলণ্ড টেস্টের ঘটনা। কলকাতার ইডেনে তৃতীয় দিনের খেলা চলছে, ব্যাট করছে শাস্ত্রী-আজাহার-উদ্দিন। ইংলণ্ডের বোলার কাওয়ানস্ আবেদন জানাল—বলের আকৃতি পাল্টে গেছে বলে তার মনে হচ্ছে, পরিবর্তে আর একটা বল দেওয়া হোক।

এ ধরণের ঘটনা ক্রিকেটের ইতিহাসে খুবই সাধারণ, বিশেষতঃ যখন পেস-বোলাররা আক্রমণে থাকেন। প্রায়শঃই বলের আকৃতি সামান্য পাল্টাতে পারে, সুতরাং আম্পায়ারের তত্ত্বাবধানে থাকে বেশ কয়েক ডজন ক্রিকেট বল। কত ওভার পুরোনো, তার বাইরের গা কতটা চকচকে, এমনি সব নানা দিক বিবেচনা করে আম্পায়ার যাতে আর একটা যুতসই পুরোনো বল বোলারের হাতে তুলে দিতে পারেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, বল সামান্য একটু আকৃতি পরিবর্তন করলে বোলারের অত মাথা-ব্যথা কেন ? এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে বলের আকৃতি একটু পাল্টে গেলে বরং বোলাররাই বাড়তি সুবিধে পাবেন, কারণ বলের অসমান আকৃতির জন্যে মাটিতে বল পড়ে ওঠার মুখে তা বাতাসে বাঁক নেবে হঠাৎ। পরিভাষায় যাকে বলে 'সুইং' নেওয়া। যাঁরা টেস্ট ক্রিকেট খেলেন, তাঁরা কি আর এই সাধারণ ঘটনাটা লক্ষ্য করেন নি ? মনে হয় করেছেন নিশ্চয়। কারণ কলকাতার মাঠের ফাস্ট ডিভিশন এক বোলারকে প্রশ্ন করতেই তিনি জবাব দিলেন,—বল সুইং করে ঠিকই কিন্তু একটু তেবড়ে যাওয়া বল, মাটিতে পড়ে খানিকটা 'স্লো' হয়ে যায়। ফলে স্লো-বল যতই সুইং নিক না কেন, ব্যাটসম্যান তাকে পিটিয়ে ছাতু করবে।

একদম সত্যি অভিজ্ঞতা। ক্রিকেটের পরিসংখ্যান বলে যেক্ষেত্রে বোলার বল বদলের আবেদন করার পর আম্পায়ার আবেদন

নাকচ করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে রান ওঠার হার বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। তাহলে রহস্যটা কি ? এর সমাধান কিন্তু একটু মাথা খাটালেই পাওয়া যাবে।

বলের আকৃতি পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে বলের ভেতরে যে কর্ক থাকে, তার গোল-আকৃতি খানিকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া। এতে বাইরের থেকে সামান্য টাল খাওয়া চেহারা নিলেও, ভেতরটা যায় বেশ খানিকটা নরম হয়ে। বোলারদের আসল আপত্তি কিন্তু এইখানে। বলের ভেতরটা নরম থাকলে যত দ্রুতগতিতেই বল করা যাক না কেন, নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলের গতি কমতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, এই বল হঠাৎ করে লাফিয়েও উঠবে না, ফলে ব্যাটস্-ম্যানের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। এই অভিজ্ঞতা ক্রিকেট খেলোয়াড়-মাত্রেই আছে।

পাড়ার মাঠে ডিউস্-বলের থেকে 'রবার-ডিউস্' বা 'কর্কেট' বলে খেলা যে বেশী অসুবিধেজনক, তার কারণও এটাই। 'কর্কেট' বলের মাঝখানটা শক্ত, ফলে বল মাটিতে পড়ে হঠাৎ দ্রুত ছুটে আসে কিংবা লাফিয়ে ওঠে খামখেয়ালী ভাবে। কিন্তু 'ডিউস' বলের বেলায় তা হবার উপায় নেই। বল যত পুরোনো হবে, ভেতরের কর্ক তত নরম হবে ফলে বল তার গতি হারাবে। কিন্তু ধরা যাক বলটার একটু আকৃতিগত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ভেতরটা একটুও নরম হয়নি। বোলারের তখন দারুণ সুবিধেজনক অবস্থা। বল হঠাৎ করে লাফাবে, বাতাসে অনেক বেশী বাঁক নেবে—ব্যাটসম্যানের একেবারে বেসামাল অবস্থা। শোনা যায় চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলার পর থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে যদি আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, তার বদলে সমান ওভার খেলান অন্য একটা বল দিয়ে তা প্রতি-স্থাপিত করতে হবে। সেই থেকেই নিয়মটা চলে আসছে।

তবে বল বদলের জন্য আবেদন জানাতে পারে একমাত্র বোলারই, ব্যাটসম্যান নয়। ফাস্ট-বোলার যখনই দেখে বল মাটিতে পড়ে মন্থর

হয়ে হয়ে যাচ্ছে সে বল পরীক্ষা করে বল বদলের আবেদন জানায়। আশা, নতুন বলের ভেতরের কর্কটা হয়তো শক্ত, ফলে তা লাফাবে বেশি !

অবশ্য টেস্ট পর্যায়ে বল-বদলের ঘটনা সব থেকে বেশী ঘটে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের খেলায়। কারণটা আর কিছুই না, ওঁদের ব্যাটস-ম্যানদের দাপট। বেধড়ক পিটে প্রায়শই ওঁরা বল নরম করে দেন, ফলে বোলারকেও বল পাল্টানোর আবেদন করতে হয় বার বার।

তবে ক্রিকেটের মাঠে বল-বদল ছাড়াও বোলার বদলেরও একটা সুবিধেজনক দিক আছে বৈকি। বিশেষতঃ যখন বল, ফাস্ট থেকে স্পিনারের হাত বদল হয়! পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়, স্পিনারদের মধ্যে তাঁরাই বেশী সফল যাঁরা ইচ্ছে মতো বলের 'ফ্লাইট' নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। 'ফ্লাইট'—অর্থাৎ বাতাসে বল ভাসান। এর কারণটাও বোঝা শক্ত নয়, 'রেফারেন্স অবজেকট' খুঁজে না পাওয়ায় ব্যাটসম্যানদের হয় মুশকিল। একটা বরং উদাহরণ নেওয়া যাক।

ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে আছি, একটা মশা কানের কাছে পিনপিন্ করছে। বারবার মারতে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই মশাটাকে নাগাল পাচ্ছি না। অথচ চেয়ারটা যদি একদম দেওয়ালের কাছ বরাবর থাকতো, সেক্ষেত্রে মশাটাকে মারতে অসুবিধে হত না, কারণ মশাটার কাছাকাছি দেওয়াল থাকায় দেওয়ালের সাপেক্ষে মশাটার গতিবিধি অনুসরণ করতে চোখের বিশেষ অসুবিধে হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেওয়াল 'রেফারেন্স অবজেক্ট' হিসেবে কাজ করল। ঘরের মাঝবরাবর জায়গায় নাগালের মধ্যে 'রেফারেন্স অবজেক্ট' না থাকায় মশা কেবলই হাত ফস্কে যায়।

স্পিন-বলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। বোলার যখন বলটা ঝুলিয়ে দেন, তখন বলের গতি অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যাটসম্যানের কোন 'রেফারেন্স অবজেকট'ই চোখে পড়বে না। বলের পশ্চাতপটে শুধুমাত্র নীল-আকাশ! আর 'রেফারেন্স অবজেক্ট' না থাকলে

অবস্থাটা সহজেই অনুমান করা যায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যাট আর বলের সংযোগ ঘটল না। বলের ফ্লাইটের চাতুরীতে ব্যাটসম্যান 'ক্রীজ' ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন—উইকেট কীপারই বা সুযোগটা ছাড়বেন কেন? কিংবা হয়তো ব্যাট ও বলের সংযোগ ঘটল ঠিকই, কিন্তু ব্যাটসম্যান যে ভাবে চাইছিলেন, ঠিক সেভাবে নয়। ব্যাটম্যান ব্যাট চালালেন সজোরে, ব্যাটের কানায় লেগে বল চলে গেল সোজা হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডস্‌ম্যানের কাছে। বলের ফাঁদে ফেলে ব্যাটসম্যানদের বোকা বানাতে এক সময় ওস্তাদ ছিলেন ভারতীয় স্পিনাররা, যখন দলে ছিলেন প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরাঘবনের মতো বোলাররা। পরববর্তী যুগে দিলীপ দোশী। এখন সে সব রামেরাও নেই, নেই সেই অযোধ্যাও।

বিশ্বরেকর্ড কি এমনিতে হয় ?

একজন মানুষ কত জোরে ছুটতে পারে ?

উত্তরে আপনি নিশ্চয় বলবেন, অলিম্পিক বিশ্বরেকর্ডগুলো দেখলেই তো হয়। ১৯৮৪-র লস এঞ্জেলসের রেকর্ড বলে—একজন পুরুষ দ্রুততম গতিতে ১০০ মিটার অতিক্রম করে ৯·৯৯ সেকেণ্ডে, একজন মহিলার ক্ষেত্রে সময়টা দাঁড়ায় ১০·৯৭ সেকেণ্ডে। হ্যাঁ—এই দুটি বর্তমান বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী এবং অধিকারিণী হচ্ছেন যথাক্রমে কার্ল-লুইস এবং ইভলিন অ্যাসফোর্ড। একটু পরিসংখ্যানের ওপর নজর বোলালেই দেখবেন মানুষের দক্ষতা ক্রমেই বাড়ছে। পঞ্চাশের দশকে ১০০ মিটার অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড যেখানে ছিল কম বেশি ১২ সেকেণ্ড, আশির দশকে তা এসে পৌঁছেছে ১০ সেকেণ্ডেরও কমে। আর শুধু ১০০ মিটার দৌড়ই বা কেন, রেকর্ড হচ্ছে প্রায় প্রতিটি ইভেণ্টেই—সাঁতার, হাইজাম্প, লংজাম্প, ডিসকাস থ্রোয়িং, কিসে নয় ? আসলে বিজ্ঞানীরা এখন একটা কথা প্রায়ই বলছেন—যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বাড়ানর জন্যে যদি নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হতে পারে তাহলে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ানর কথা ভাবা যাবে না কেন ? মানুষের শরীরও তো উন্নতমানের যন্ত্র বিশেষই !

সত্যি কথা বলতে কি, কর্মদক্ষতা বাড়ানর ইচ্ছে মানুষের সহজাত। বিশেষতঃ সেই সব মানুষদের তো বটেই যাদের শরীরের পটুতার ওপর নির্ভর করে নাম, যশ, অর্থ—সব কিছুই ! আমাদের দেশে খেলাধূলোর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা কথাটা উপলব্ধি করেন নিশ্চয়, কিন্তু কর্মদক্ষতা বাড়ানর জন্য এখনো সাবেক ব্যায়াম, পি-টি আর প্র্যাকটিসই ভরসা। খেলাধূলোর আসরে বিজ্ঞান কিন্তু ঠিকমত জায়গা করে নিতে পারেনি আজও—অন্ততঃ আমাদের দেশে ! অথচ আমরা যদি বাইরের দেশগুলোর দিকে তাকাই—তাহলে ছবিটা হবে একেবারে উল্টো। পশ্চিম জারমানি, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

রাশিয়া, জাপান—এসব দেশের সরকার নীতিগতভাবে বিশ্বাস করেন যারা খেলাধূলো করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে —তাদের বেছে নিতে হবে একেবারে ছোটবেলায়। খেলাধূলোই হবে তাদের নেশা, পেশা, দিনরাত্রির স্বপ্ন—সব কিছু। তা না হলে আন্তর্জাতিক আসরে দাঁড়ানর জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। খেলাধূলো করলেই তো হল না, এর সঙ্গে দরকার বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রস্তুতি এবং নিজেদের সেইভাবে তৈরী করা। রাশিয়া বা জাপানে তো রীতিমত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ধাপে ধাপে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তা হয় সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে।

প্রশ্ন আসতেই পারে—ট্রেনিং আবার বিজ্ঞানভিত্তিক কি? উত্তরটাও বরং ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক। বিশেষজ্ঞদের ধারণা—কে কোন বিষয়ে পারদর্শী হবে, তা কিন্তু প্রাথমিকভাবে ঠিক করার দায়িত্ব ক্রীড়াবিশেষজ্ঞদের, অন্য কারো নয়। এর জন্যে বিশেষ করে দেখতে হবে—যে বাচ্চাটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তার শারীরিক গঠন, পারিবারিক ইতিহাস, মানসিক গঠন, সবকিছু।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বরং পরিষ্কার হবে। ছোটবেলা থেকে যে ছেলেটি ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে, তার শারীরিক গঠন, মানে পেশী সংস্থান, উচ্চতা, শরীরের ভারকেন্দ্রের অবস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল—ছেলেটি যদি বাস্কেট বল খেলত, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে কিছু বাড়তি সুবিধে পেত। এখন ক্রীড়াবিশেষজ্ঞের কাজ হবে তার মানসিক গঠন পরীক্ষার জন্য মনস্তাত্বিকের পরামর্শ নেওয়া। তিনি ছেলেটির হাবভাব, আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে বলে দেবেন ঐ ছেলেটি বাস্কেট বলের ব্যাপারে কতটা উৎসাহী। যদি দেখা যায় ছেলেটির বাস্কেটবল সম্পর্কে বিশেষ কোন উৎসাহ নেই, তখন ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ আশা ছেড়ে দেবেন—ছেলেটিকে খেলাধূলোর স্কুলে ভর্তি করা চলবে না।

অথচ আমাদের দেশে এখনো খেলাধূলোর ব্যাপারটা ব্যক্তিগত

রুচির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকবছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন —আজকে যারা যে খেলার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের মধ্যে অনেকেরই শরীরের গঠন বলছে তারা অন্য খেলায় গেলে অনেক ভাল ফল করতো। এমন বহু ফুটবলার আছেন যাঁরা ঠিক মতো প্রশিক্ষণ পেলে ভাল সাঁতারু কিংবা দৌড়বিদ্ হতে পারতেন!

বাইরের দেশের প্রশিক্ষণের কথাতেই ফিরে আসি। ধরা যাক, একটি ছেলে বা মেয়েকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হল—'এর মধ্যে অ্যাথলেট হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল'! কিন্তু এর পরে প্রশ্ন আসবে—কোন ধরনের বিষয়ে ঐ ছেলে বা মেয়েটি সব থেকে বেশি সাফল্য লাভ করবে? ১০০ মিটার না ৪০০ মিটার দৌড়? হাইজাম্প না লংজাম্প?

এর জন্যেও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন করিয়ে প্রাথমিক ভাবে দেখা হয় তাদের হার্ট বা ফুসফুস ঐ ধরনের পরিশ্রমের ধকল সইতে পারবে কি না, তাদের পেশীর মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অথবা কত সময়েই বা তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিংবা ক্লান্তি কাটাতেই বা কত সময় লাগছে? এর পরে কাজে নামেন জীব-রসায়নবিদ বা বায়োকেমিষ্টরা। খুব সূক্ষ্ম একচিলতে পেশীর তন্তু নিয়ে তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেন এর কার্যক্ষমতা কেমন!

কার্যক্ষমতার ব্যাপারটা বরং একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক। জীবরসায়নের বিচারে পেশীতন্তু মুলতঃ দু-ধরণের—দ্রুত সঙ্কোচনশীল বা 'ফাস্ট-টুইচ' এবং ধীরে সঙ্কোচনশীল বা 'স্লো-টুইচ' ফাইবার। প্রত্যেকের শরীরেই এই দু-ধরনের তন্তুই থাকে। তবে এদের অনুপাত ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। জীব রসায়নবিদ্‌রা দেখেছেন যাঁদের পেশীতে 'ফাস্ট-টুইচ' ফাইবার যত বেশি, তাঁরা স্বল্প-পাল্লার দৌড় বা সাঁতারে তত ভাল ফল দেখাবেন। এদের পেশীতন্তুগুলো উদ্দীপিত হয় খুব তাড়াতাড়ি, ক্লান্তও হয় চটপট। অপরপক্ষে, যাঁদের পেশীতে

'স্লো-টুইচ্'-ফাইবার বেশি তাদের পেশী উদ্দীপিত হতে সময় লাগে বেশি, আবার তারা ক্লান্তও হয় দেরিতে! সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যাঁরা ১০০ মিটার দৌড়ে খুব ভাল ফল করেন, তাঁদের পেশীতন্তুর শতকরা ৭৫ থেকে ৯০ ভাগই দ্রুত সঙ্কোচনশীল উপাদানে তৈরি! আবার দূরপাল্লার দৌড়, যেমন ম্যারাথন রানার হিসেবে যাঁদের সুনাম আছে, তাদের শরীরে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগই 'স্লো-টুইচ' ফাইবার!

অবশ্য শুধুমাত্র পেশীর উপাদান বিশ্লেষণ করেই জীব রসায়নবিদ্‌রা সন্তুষ্ট নন, খেলোয়াড়দের ট্রেনিং-এর শেষে রক্তের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষতঃ ল্যাকটিক অ্যাসিডের মাত্রা বা মূত্রের অম্লত্ব, ক্ষারত্বের পরীক্ষা—এসব তাঁরা প্রতি সপ্তাহেই মাপতে থাকেন। এর মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিডের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পেশীর অবসাদ বাড়বে। সুতরাং বিভিন্ন ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যারা রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিড বৃদ্ধির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, বিজ্ঞানীরা তাদের নিয়েই বেশি আশাবাদী।

ধরা যাক, নানা প্রাথমিক পরীক্ষাতে প্রমাণিত হল একটি ছেলে বা মেয়ে দৌড়ের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। পরবর্তী ধাপে এর ওপর নজর রাখা হবে আরও উন্নতমানের নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যেমন ধরুন, এদের বিশেষভাবে তৈরী জুতো পরিয়ে দৌড় প্র্যাকটিশ করান হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার এক বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ গাইডন এরিয়েল এমন এক ধরনের জুতো তৈরী করেছেন যার মধ্যে বিশেষ যান্ত্রিক কলাকৌশল করা আছে।

না, এই জুতো 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েনের' জুতো নয় যে চক্ষের নিমেষে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছে দেবে। বরং এই জুতোর মধ্যে 'মাইক্রোচিপস্' লাগান থাকায় দৌড়ের সময়কার নানারকম তথ্য সেটি সঞ্চয় করে রাখবে। দৌড়ের পরে জুতোর থেকে পাওয়া তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা হবে। জানা যাবে

কোন বিশেষ মুহূর্তে সে কোন গতিতে দৌড়েছিল, ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে তার কত শক্তি ক্ষয় হল—এমনি নানা টুকিটাকি তথ্য।

সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রশিক্ষক ঠিক করবেন দৌড়ের কোন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি আছে, অর্থাৎ তার স্টার্টিং খারাপ না ফিনিশিং-র সময় তার গতি কমে যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘাটতি পূরণ করতে তাকে সেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এক দিকে, অপরদিকে দেখা হবে শারীরিক কোন অক্ষমতা এর জন্য দায়ী হচ্ছে কি না। অর্থাৎ পায়ের বিশেষ কোন্ পেশী কমজোরি, থাকায় সে ঐ মুহূর্তে ভাল দৌড়তে পারছে না, কিংবা শরীরের ওজন যদি আরো দু-কেজি কম হত তাহলে এ ধরণের ত্রুটি কাটান যেত কি না ইত্যাদি!

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে; হয়ত বা সেই কমজোরি পেশীকে মজবুত বানাতে বিশেষজ্ঞ ঠিক করবেন সেই পেশীর জন্য ছোটখাট কোন অস্ত্রোপচার দরকার অথবা তাকে কি ধরণের খাওয়ার নিয়ম মেনে চলতে হবে।

আবার ধরা যাক অন্য ধরনের খেলার কথা—ফুটবল বা বাস্কেটবল কি ক্রিকেট, যেখানে ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কোন একজন ফুটবলার উত্তেজনার মুহূর্তে গোলে 'শট্' নিল কিন্তু একচুলের জন্য তা বার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। এই এক মুহূর্তের ভুলগুলোই কিন্তু খেলার ভাগ্য পালটিয়ে দেয়।

এ ত্রুটি সংশোধনের উপায়ও স্থির করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিম জার্মানি—ফুটবল দুনিয়ায় যাদের এক নম্বর নাম, তাদের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেবার সময় টি. ভি. ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিটি খেলার পর ক্লাস করে আলোচনা হয় কি ধরনের ভুল হল, কাকে 'পাশ' দিলে আরো ভাল হতে পারত ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্যেও বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের টি.ভি. ক্যামেরা ব্যবহার করছেন। আলট্রা-হাইস্পীড ফিল্ম ব্যবহার করে সেকেণ্ডের হাজার ভাগের একভাগ সময়েও তাঁরা ছবি তুলছেন এবং

কোন্ বিশেষ মুহূর্তে কোন ত্রুটি কেন হল তা বুঝতে ঐ এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের ফ্রেমকে তাঁরা কমপিউটারে বিশ্লেষণ করছেন। এটা করার জন্য ছবিটি প্রথমে পর্দায় ফেলা হয়। পর্দাটি গ্রাফের কাগজের মত—ফলে পায়ের প্রতিটি বিন্দুকে 'কটি' ও 'ভুজ' (co-ordinates) হিসেবে কল্পনা করে ঐ হাজারটি ছবিকে বিশ্লেষণ করে বলা সম্ভব পায়ের একটি অংশ কিভাবে বেঁকলো, কতটা বেঁকলো, কি গতিতে বলে 'শট' নিল এবং কি ভুলের ফলে বলের গতিপথ সামান্য ঘুরে গেল! এই পদ্ধতিগুলো এখন সবদেশের ক্রীড়াবিজ্ঞানীরাই কাজে লাগাচ্ছেন। সাঁতারে বা দৌড়ে সময় কমান বা অ্যাথেলেটদের সময়রেকর্ড আরও উন্নত করতে বহুলভাবে এখন কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সবশেষে একটা কথা বলি, আজকাল আমরা প্রত্যেকেই দেখছি রেকর্ড ভাঙ্গা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার মান উন্নয়নের ব্যাপারে খেলোয়াড়, সাঁতারু বা দৌড়বিদের শারীরিক পটুত্বই কি সবশেষ কথা? ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা বলছেন, না—শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে 'ফিটনেস' বাড়ালেই চলবে না, তার সঙ্গে দরকার আদর্শ পরিবেশ। যেমন সাঁতারুর পক্ষে জলের পরিবেশ, দৌড়ের জন্য মাঠের গড়ন গঠন, এসবের ওপরও নির্ভর করবে প্রতিযোগীর দক্ষতা।

বছর ছয়েক আগে দুই মার্কিন ক্রীড়া-বিজ্ঞানী, থমাস ম্যাকমোহন এবং পিটার গ্রীন প্রথম বলেন—মাঠের অবস্থা পরিবর্তন করেও 'রেকর্ডের' মান আরও উন্নত করা সম্ভব। অনেকেরই মনে আছে বোধহয় গত নবম এশিয়াডে দিল্লীর তালকাটোরা স্টেডিয়ামে জলের তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্টমানে বজায় রাখতে কর্মকর্তাদের কি রকম সচেষ্ট থাকতে হয়েছিল?

তেমনি আবার দৌড়ের সময় পা কোথায় পড়ছে, তার ওপর নির্ভর করবে পরবর্তী পদক্ষেপ দ্রুত না মন্থর হবে। ম্যাকমোহন এবং গ্রীন পরীক্ষামূলকভাবে একটি 'ট্র্যাক' বা দৌড়নোর জন্য ১০০

মিটার লম্বা একফালি জমি তৈরী করালেন নিচে প্লাইউড এবং ওপরে পলি ইউরেথেনের কৃত্রিম আচ্ছাদন দিয়ে। দেখা গেল এতে জমির উপরতল, সাধারণ মাটির তুলনায় অনেক কম বাধা দিচ্ছে পা-কে, একই সঙ্গে তলার প্লাইউড একটা হাল্কা স্প্রীং-র মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

ঠিক একই চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন ইংলণ্ডের ম্যাকলিনান সাহেব। তিনি নিজের পায়ের হাড়ে তীক্ষ্ণ সূঁচের মত সেনসর পিন ফুটিয়ে বিভিন্নভাবে তৈরী মাঠের ওপর দৌড়লেন এবং সেনসর থেকে পাওয়া তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে দেখলেন পা যেভাবে জমির ওপর ক্রিয়া করছে, জমিও কি ভাবে তার বিপরীত ক্রিয়া পায়ের ওপর করছে। অর্থাৎ নিউটনের সূত্র অনুসারে প্রতিটি ক্রিয়ারই যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে সেটা পা ও জমির ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে তা তিনি বিশ্লেষণ করলেন। দেখা গেল জমির গঠন অনুসারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া কমে বা বাড়ে, অর্থাৎ তা দৌড়ের গতির পক্ষে সহায়ক বা প্রতিকূল হয়।

১৯৭৯-তে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউইয়র্ক ম্যাসিডন স্কোয়ার গার্ডেনে এইরকম পরীক্ষামূলক দৌড়নোর জমি তৈরী করান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক দৌড় প্রতিযোগিতা সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেল প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দৌড়ের সময় তিন থেকে পাঁচ সেকেণ্ড কমিয়ে ফেলেছে এবং বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ড হল যা সেই সময়কার বিশ্ব-রেকর্ডের নাগাল ধরে ফেলে!

আজকাল তাই দেখা যাচ্ছে মাঠের গঠনও ক্রমে পাল্টাচ্ছে, আসছে 'ফাইবার গ্রাস', 'অ্যাসট্রো-টার্ফ'। এতে একদিকে যেমন বাড়ছে খেলাধূলোর মান তেমনি পড়ে গিয়ে চোটের মাত্রাও হচ্ছে কম। আর ক্রীড়া বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে এখন পাল্টাচ্ছে চিকিৎসার ধরনধারন—সূচনা হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক নতুন শাখা, ক্রীড়াচিকিৎসা বা স্পোর্টস-মেডিসিন।

টাকের টুকিটাকি

পঞ্চানন ঘরে ঢুকতেই সবাই হই-হই করে উঠল।

—কিরে, তোর অমন সাধের চুলগুলো সব কোথায় রেখে এলি ?

কামিয়ে ফেলেছি। —গম্ভীরমুখে জবাব দেয় পাঁচু।

কিন্তু হঠাৎ! —চোখ কুঁচকে শুধোয় ত্রিদিব।

—মেজোমামার সাজেশন। কাল সকালে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। চা খেতে খেতে ছবির অ্যালবামে নজর বুলোতে গিয়ে আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, —পাঁচু, তোর মাথা থেকে চুল ওঠে ?

আমি ঘাড় নাড়তেই মেজোমামা বললেন,—ভেরী ব্যাড। তোদের টাকের বংশ। তোর চুল উঠছে, তোর বাবার মাথার সামনের দিক ফাঁকা, ছবিতে দেখছি তোর দাদুর মাথা পুরোটাই ছিল একটা রিফ্লেক্টর। ভাল চাস্ তো আজকেই মাথা ন্যাড়া করে আয়। ন্যাড়া হলে চুল গজায় ঘন হয়ে। প্রতি মাসে একবার করে পর পর বারো বার ন্যাড়া হলে আর চুল উঠবে না, ভবিষ্যতেও টাক পড়ার ভয় থাকবে না তোর।

গতকাল কত তারিখ ছিল ? —পায়ে পায়ে সোমনাথদা কখন ঘরে ঢুকেছেন খেয়াল করিনি কেউ-ই।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করার ফাঁকেই পানু বলে ওঠে, —পয়লা এপ্রিল, মানে ....

সোমনাথদা বললেন,—হ্যাঁ, ভবেশদা, মানে পঞ্চাননের মেজ-মামা পঞ্চাননকে এপ্রিল ফুল করেছে। ছেলেবেলা থেকেই ভবেশদাকে বিলক্ষণ চিনি।

পঞ্চাননের মুখ ইতিমধ্যে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে,—তাহলে সোমনাথদা, ন্যাড়া হলে টাক পড়া থামবে না ?

—দূর বোকা। টাক তো সব মানুষেরই পড়ে। কারো বেশী কারো কম। ছোটবেলায় সবারই কেমন মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল থাকে, বুড়ো হলে বেবাক লোপাট! টাক পড়া অবশ্য শুরু তোদের এই বয়স থেকেই!

অবিশ্বাসী মুখ করে মাথায় হাত বোলায় ত্রিদিব,—কই সোমনাথদা, আমার মাথায় তো······

—পড়ছে পড়ছে। আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে রোজ দুবেলা চুলের স্টাইল নিয়ে কসরত করার সময় তো আর কোনদিকে দৃষ্টি থাকে না। অথচ এদিকে চুলের সীমানা কপালের দুপাশ বরাবর একটু করে পিছোচ্ছে তা কি নজর করেছিস?

সনাতন বলে,—তাই তো?

মুচকি হাসেন সোমনাথদা,—এই হলো শুরু। এই সময়টাতে, ছেলেদের শরীরে কয়েকটা হরমোনের পরিমাণে তারতম্য ঘটে, বিশেষত পুরুষ হরমোন অ্যানড্রোজেনের পরিমাণ রক্তে বাড়ে, যার প্রভাবে টাকের সূত্রপাত। ক্রমে যখন আমার বয়সে পৌঁছবি, তখন দেখবি মাথায় সামনে বেবাক ফাঁকা, পেছন দিকেও দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

কিন্তু কিন্তু করে পাঁচু বলেই ফেলে কথাটা,—সোমনাথদা, আপনার টাকের ধাত। নাহলে এ বয়সে এত চওড়া কপাল হয় না।

সোমনাথদা অবশ্য একটুও রাগ করেন না পাঁচুর কথায়। বললেন,—ঠিক বলেছিস্। আমাদের টাকের বংশ। আমার বড় পিসিমার মাথায় বেশ টাক ছিল, মাথার সামনের দিকটাতে।

ত্রিদিব বলল,—ধ্যুৎ। মেয়েদের আবার টাক হয় নাকি?

সোমনাথদা বললেন,—সংখ্যায় বেশী না হলেও টাকমাথা মহিলা আছেন বৈকি। আমার পিসিমার কথাই ধর না কেন। আসলে মানুষের আয়ু যেমন মোটামুটি নির্দিষ্ট, চুলেরও তাই। কোষের মধ্যেকার অনুবীক্ষনিক ডি. এন-এ অনু বা 'জীন', তাদের মধ্যে এমন 'সঙ্কেত' পোরা আছে, যা ঠিক করে চুলের আয়ু কত হবে।

ত্রিদিব বলল,—একটু বিশদভাবে বলুন না?

সোমনাথদা বললেন,—তাহলে একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখ সনাতন। পকেট থেকে টাকা বার করে সনাতনের দিকে এগিয়ে দেন সোমনাথদা।

পাঁচু বলল,—খাওয়ানোর ব্যাপারে সোমনাথদা 'কল্পতরু'। আপনার ক্ষেত্রে দেখছি টাক এবং টাকা সহাবস্থান করছে।

হাত ওল্টালেন সোমনাথদা। —টাকার বদলে টাক দিলি মা, আ-কার দিতে ভুলে গেলি! টাকা থাকলে এতদিনে বাড়ী গাড়ী সব হয়ে যেত। যাকগে, যে কথা বলছিলাম। লোমকূপ, অর্থাৎ যার মধ্যে চুলটা বসান আছে, সেই লোমকূপের নীচে, চামড়ার মধ্যে একগোছা অত্যন্ত সক্রিয় কোষ থাকে, যাদের নাম 'হেয়ার ম্যাট্রিক্স'।

এদের সঙ্গে টাকের সম্পর্ক কোথায়? —প্রশ্ন করে পাঁচু।

—আসলে চুলের জীবনে তিনটে দশা আছে। অ্যানাজেন, ক্যাটাজেন আর টেলোজেন। অ্যানাজেন অবস্থায় ম্যাট্রিক্সের কোষগুলো বাড়তে থাকে চট্‌পট, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করে ট্রাইকো কেরাটিন নামের বিশেষ একধরনের প্রোটিন। চট্‌পট বেড়ে ওঠার সূত্রে কোষগুলো লোমকূপের মধ্যে দিয়ে ঠেলে উঠতে থাকে ফলে চুলও লম্বায় বাড়তে থাকে।

—কিন্তু চুলের রঙটা কালো হচ্ছে কি করে?

— এটাও ঐ ম্যাট্রিক্স স্তরের কেরামতি। এখানে বিশেষ এক ধরনের কোষ থাকে যাদের নাম মেলানোসাইট। এরা 'মেলানিন' বলে একধরনের কালো রঙের প্রোটিন তৈরী করে যারা চুলের কোষের ভেতর ফাঁপা জায়গায় ঢুকে পড়ে। এর পরের অবস্থা, অর্থাৎ ক্যাটা-জেন স্তরে কোষবৃদ্ধি বন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে চুলের গোড়ার কোষগুলো ক্ষয়ে যায়। শেষমেষ চুলটা ম্যাট্রিক্স থেকে আলাদা হয়ে পড়ে।

—অর্থাৎ তখন চুল পড়ে যায়? পান্নুর জিজ্ঞাসা।

—ঠিক তাই। চুল পড়ে যাবার পর শুরু হয় টেলোজেন পর্ব। এই অবস্থায় চুলের গোড়ার কোষগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পরে আবার যখন অ্যানোজেন শুরু হয়, আবার একটা নতুন চুল

গজায়, যা কি না আলগাভাবে লেগে থাকা পুরোন চুলটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে তার জায়গা দখল করে বসে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ম্যাট্রিক্সের নীচে থাকে রক্তবহা-নালী, যার থেকে ম্যাট্রিক্সের কোষগুলো পুষ্টির যোগান পায়।

ত্রিদিব বলল,—একটু খটকা থেকে যাচ্ছে যে? অ্যানাজেন থেকে ক্যাটাজেন এবং টেলোজেন অবস্থায় গেলে সব চুল তো একসাথে পড়ার কথা। তা কি হয়?

সোমনাথদা বললেন, প্রশ্নটা তুই ভালই তুলেছিস। প্রতিটি চুলের জীবনে একই সময়ে যদি এই পর্যায়গুলো শুরু এবং শেষ হতো, তাহলে সব চুল একসাথে গজাতো, সমান লম্বা হতো, আবার একসঙ্গে ঝরে যেতো। যেহেতু প্রতিটি চুলের ক্ষেত্রে একেকটা পর্যায় একেক রকম, তাই প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য সমান না, সারাবছরই কিছু কিছু চুল পর্যায়ক্রমে খসে যায় এবং নতুন করে গজায়।

পান্নু বলল,—কতদিন পর্যন্ত চুল বাড়তে পারে?

ধর, মাথার চুলের অ্যানাজেন তিন থেকে আটবছর। ক্যাটাজেন এবং টেলোজেনের সময় গড়ে ২১ দিন এবং ৯০ দিন। সাধারণভাবে যৌবনে একজন সুস্থ মানুষের মাথার একলাখ চুলের মধ্যে হাজার দশেক চুল টেলোজেন অবস্থায় থাকে। প্রতিদিনই কিছু লোমকূপে নতুন চুল গজাচ্ছে, কিছু লোমকূপ থেকে পুরোন চুল পড়ে যাচ্ছে। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে নির্দিষ্ট একটা বয়সের পরে টেলোজেন স্তরে থাকা চুলের সংখ্যা কমে যায়, ম্যাট্রিক্সের কোষগুলোও সক্রিয় থাকে না, ফলে চুলের জায়গায় দেখা যায় টাক। আগেই বলেছি, কোন চুল কোন পর্যায়ে কতদিন থাকবে, তা নির্ভর করবে, বংশানুর ওপর। তাই অনেকেরই দেখা যায় অল্প বয়সেই টাক পড়ছে, আবার অনেক বয়স্ক মানুষের মাথাতেও দিব্যি চুলের শোভা নজরে পড়বে। তবে মনে রাখতে হবে, কোন কারণে লোমকূপ নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে চুল গজানোর আশা চিরতরে নির্মূল!

কথার ফাঁকে পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করে,—যাদের মাথায় একবার

টাক পড়ে গেছে তাদের মাথায় কি আবার চুল গজানো সম্ভব?

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন সোমনাথদা।

—ঐসব হেয়ার ফার্টিলাইজার, ওষুধ, পেঁয়াজ, লেবুর রসে কিছু হবে না। একমাত্র সমাধান হল গ্রাফটিং।

সেটা আবার কি?

—আসল ব্যাপারটা অনেকটা ফুলগাছ পোঁতার মতো। মাটি থেকে তুলে টবে লাগিয়ে দাও। বাইরের দেশে বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কাজ করছেন বিস্তর। প্লাষ্টিক সার্জারীর রকমফের আর কি!

একটু দম নিয়ে সোমনাথদা বললেন, —মাথার পেছন থেকে চুলশুদ্ধ চামড়ার ছোট্ট ছোট্ট টুকরো নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় সামনের টাকে, চুলের ধরনধারন বুঝে। এরপর মাথায় চেপে এঁটে দেওয়া হয় 'প্রেশার ব্যাণ্ডেজ', যাতে চুলশুদ্ধ চামড়ার টুকরোর নিচেকার ছোট ছোট শিরা, টাকের নিচেকার ছোট ছোট শিরার সঙ্গে 'ফাইব্রিন ক্লটের' (Fibrin Clot) সাহায্যে বেমালুম জুড়ে যায়।

সনাতন জিজ্ঞাসা করল,—এতে ঝামেলা হয় না।

সোমনাথদা বললেন,—বিলক্ষণ। অল্প অল্প জায়গা নিয়ে বারবার গ্রাফটিং করতে হয়। এতে সময় লাগে প্রচুর, খরচও বিস্তর।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল,—সোমনাথদা, অন্য কোন সহজ উপায় নেই?

এবার মুচকি হাসেন সোমনাথদা,—তাহলে কি আর টাকমাথা মানুষদের মাথায় টাক থাকতো? অবশ্য টাক থাকার কত সুবিধে তা তোরা আর বুঝবি কি? টাকওয়ালা মানুষরা নাপিত ভায়াকে পয়সা দেন না, এমন কি তোদের মত সর্বদা পকেটে চিরুনি নিয়েও ঘোরার দরকার নেই! তাছাড়া ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্পিন বোলার টনি লক্‌কে নিয়ে সেই গল্পটা জানিস না? উনি নাকি বহু বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন স্রেফ টাকে আলো রিফ্লেক্ট করিয়েই!

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সোমনাথদা ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

[**সংযোজন :** এই টাকের টুকিটাকি লেখাটা লিখে পড়তে দিয়েছিলাম উঠতি কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে। সিরিয়াসলি লেখাটা পড়ে সত্য বলল,—দাদা, টাকের পেছনে এত কাণ্ড আছে জানতাম না তো? ব্যাগ থেকে কলম বার করে সে খসখস করে এক পদ্য ফেঁদে বসল তখুনি, নামকরণ হল 'টাক থেরাপি'। সেই কবিতাটা হুবহু তুলে দিলাম—পাঠকদের শোনাবার লোভ সামলাতে না পেরেই।

একটা লোকের ছিল মস্ত টাক,
টাক নয়তো মস্ত সে এক ঢাক ;
কঞ্চি দিয়ে
খুব পিটিয়ে
সবাইকে সে লাগিয়ে দিল তাক।
কিন্তু কেন টাক পড়েছে কারণটা তার কি,
ডায়গোনিসিস্ করলে দেব হাজার টাকা ফি।
কেউ বলে টাক বংশগত, কেউবা বলে মনের
অশান্তিতে টাক পড়েছে মেজাজী বাপধনের।
কেউ বা বলে পেটের রোগে, কেউ বা কালাজ্বরে,
আঁতেল লো কের আ-তেল মাথায় জমকালো টাক পড়ে।
কেউ বা বলে চুল উঠেছে টাক পড়েছে তাই ;
চুলের পেটে বেজায় ক্ষিদে তাই করে খাই খাই!
চুল বলে রোজ খাব খাব—ভাইটামিনের অভাব,
রুটিন মাফিক প্রোটিন খাওয়া জন্মগত স্বভাব ;
চুলের পেটে জ্যান্ত ছুঁচোর কাঁচুর মাচুর ডাক ;
আসল কারণ কেউ জানে না, তাই পড়েছে টাক।
তেল চকচক্ টাকের কারণ জানতে কি কেউ চায়?
টাকের রোগে টাক পড়েছে সন্দেহ নেই তায় !!

—এর পরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !]

লম্বা-বেঁটের রহস্য

লম্বা হওয়া কি সবসময়ই সুখের? যাঁরা লম্বা, তাঁরা বলবেন আদৌ না। তাঁদের কপালে কাট-পীসের কাপড়ে জামা প্যান্ট বানানোর সৌভাগ্য প্রায় কখনই জোটে না; অফিসটাইমে মিনিবাস কিংবা ডবল-ডেকারের দোতলায় দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা প্রতি মুহূর্তে টের পাইয়ে দেয় লম্বা হওয়ার সুখ কতো! এমন কি ডাক্তারদের মতে ঘাড়ের ব্যাথা বা বিশেষ ধরনের স্পণ্ডাইলোসিসে লম্বাদেরই ভোগার সম্ভাবনা বেশী। তবু সত্যি বলতে কি, প্রত্যেক বেঁটে মানুষই চান লম্বা হতে, বিশেষত পাশ দিয়ে যখন কোন লম্বা মানুষ বড় বড় পা ফেলে হেঁটে চলে যান।

প্রশ্ন উঠতেই পারে—এরকমটা হবার কারণটা কি? প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কেউ বা বেঁটে, কেউ বা লম্বা, হয়তো বা জন্মসূত্রে একে অপরের সহোদরও হতে পারেন! মূলগত তফাতটা কোথায়?

এক কথায় এর উত্তর দিলে বলতে হবে, তফাতটা হচ্ছে কাঠামোর গড়ন গঠনে। প্রতিমা তৈরীর সময় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রতিমা কতবড় হবে তা নির্ভর করে তার ভেতরের কাঠামোর ওপর। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তাই—যে হাড়ের কাঠামোর ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেই কাঠামোর বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতে আমাদের মাথা মিনিবাসের ছাতে ঠেকবার সম্ভাবনা আছে কি না।

এই কাঠামো কি হারে বাড়ে—তারও একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কোমরকে মাঝে রেখে ওপর আর নীচ—এই দুই ভাগে যদি আমরা আমাদের শরীরটাকে কল্পনা করি, দেখা যাবে জন্মের সময় ওপরের ভাগটা বেশী লম্বা, নীচের অংশের তুলনায় ১·৭ গুণ বেশী। জন্মানোর পর থেকেই নীচের ভাগটা বাড়তে থাকে চটপট। দু-বছর বয়সে উপর-নীচের অনুপাত এসে দাঁড়ায় ১.৩-এ। পরের বছর গুলোতে পায়ের হাড় আরও তাড়াতাড়ি লম্বা হয়, দশ বছর বয়সে

কোমর থেকে ওপর আর নীচের মাপ সমান সমান। এই অনুপাত বজায় রেখে আমরা ওপর এবং নীচের দিকে লম্বা হতে থাকি বাইশ বছর পর্যন্ত, যদিও ঝট্ করে লম্বা হয়ে যাবার ঘটনাটা চোখে পড়ে তেরো চোদ্দ বছর বয়সেই।

অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যাবার ঘটনাগুলোর ইতিহাস একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এদের পেছনে হরমোনঘটিত কোন না কোন কারণ নিশ্চয় আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর জন্যে দায়ী পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা 'গ্রোথ-হরমোনের' পরিমাণে বাড়াবাড়ি, যার প্রভাবে রোগীর উচ্চতা গিয়ে দাঁড়ায় সাত কি সাড়ে-সাত ফুট! আরেকটু বিশদভাবে বললে বলতে হয়, আমাদের প্রতি লিটার রক্তে গ্রোথ হরমোনের পরিমান দুই বা তিন মাইক্রো-গ্রাম (১০০০ মাইক্রোগ্রাম = ১ মিলিগ্রাম) এই পরিমাণ যদি বেড়ে ছয় কি সাতে দাঁড়ায়—তখনই ঘটে ঐ ধরনের বিপত্তি! অবস্থাটা ভাবুন একবার!

অবশ্য বাড়বাড়ন্ত গঠনের জন্য শুধুমাত্র 'গ্রোথ-হরমোনকে' দায়ী করা ঠিক হবে না। বেড়ে ওঠার ব্যাপারে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনেরা। দেখা গেছে থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন 'থাইরক্সিন' এবং পিটুইটারী 'গ্রোথ হরমোন', এদের কাজ একে অপরের পরিপূরক। অনেকে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় কিছু কিছু বাচ্চা দেখা যায় যারা স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াতে পারছে না, জিভটা সর্বক্ষণই সামান্য বেরিয়ে মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। ডাক্তারী পরিভাষায় এরা 'ক্রেটিন'—মানসিক প্রতিবন্ধীও বটে। এদের উচ্চতা কখনই স্বাভাবিক হবে না, যদিও এদের রক্তে 'গ্রোথ-হরমোনের' পরিমাণ স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতির দরুন 'গ্রোথ-হরমোন' তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে না। একইভাবে, কোন শিশুর থাইরয়েড গ্রন্থি হয়তো স্বাভাবিক-ভাবে কাজ করছে, অথচ মাথায় বিশেষ কোন টিউমারের দরুন বা পিটুইটারী গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার জন্য 'গ্রোথ-হরমোন' ঠিকমতো

তৈরী হচ্ছে না।

বেঁটেদের বিশ্বরেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন এক ওলন্দাজ মহিলা —পলিন মুসটার্স। জন্মের সময় তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল বারো ইঞ্চি, পরিণত বয়সে তা গিয়ে দাঁড়ায় ২৪ ইঞ্চিতে! শ্রীমতী পলিনের মতো না হলেও নিউ-জার্সির মিস সুসান বোকাউনির রেকর্ডও খারাপ নয়—উচ্চতায় পুরো তিন ফুট এবং গত ১৯৭৯-তে উনি একশ বছরের গণ্ডি ছাড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে লম্বা হওয়া, অর্থাৎ তের চোদ্দ বছর বয়সে কিশোর-কিশোরীরা যে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে যৌন-হরমোনগুলির বিশেষ এক ভূমিকা আছে। এদের প্রভাবে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা ছয় থেকে এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বায় বাড়তে পারে। তবে এই হরমোনগুলো মূলতঃ কাজ করে মেরুদণ্ডের ওপর, হাত বা পায়ের হাড়ে নয়। বরং ছোটবেলা থেকে হাত বা পায়ের যে সব হাড় বেড়ে চলেছিল, তাদের পরিধি বাড়িয়ে অস্থি বৃদ্ধির পরিপূর্ণতা আনে এই হরমোনেরা। অর্থাৎ হাড়ের বৃদ্ধির শেষ অঙ্কের যবনিকা-পাতের দায়িত্ব এদের।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, কাঠামোর গড়ন গঠনের মূল দায়িত্ব গ্রোথ-হরমোন, থাইরক্সিন ও যৌন-হরমোন অ্যানড্রোজেনদের ওপর ন্যস্ত থাকলেও পাশাপাশি ইনসুলিন, অ্যাডরেনাল গ্রন্থির বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন, পিনিয়াল, থাইমাস এবং প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির নিঃসরণের ভূমিকাও উপেক্ষা করার মতো নয়। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য 'গ্রোথ-হরমোন' মূলতঃ দায়ী হলেও আজকাল প্রায় সব বিজ্ঞানীদেরই ধারণা 'গ্রোথ-হরমোন' সরাসরি এই কাজ করে না —পিটুইটারী গ্রোথ-হরমোনের প্রভাবে যকৃতে তৈরী হয় 'সোমাটোমেডিন' নামে বিশেষ এক প্রোটিন হরমোন, যা কি না তরুনাস্থিকে হাড়ে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে।

রসায়নবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের অস্থি বা হাড় হচ্ছে হাইড্রক্সি-অ্যাপাটাইট জাতীয় লবণ, যা তৈরী হয়েছে মাঝখানের একটা

কোলাজেন ধরনের তন্তুর চাদরের ওপর—প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট লবণের আস্তর জমে। বাচ্চারা যখন লম্বায় বাড়ে, তখন দেখা গেছে শরীরের লম্বা হাড়গুলোর দু-প্রান্তে বৃদ্ধি শুরু হয়। হাড়ের দুপ্রান্তে মাথায় কাছাকাছি তরুনাস্থি বা কার্টিলেজের বিশেষ এক অংশ—যার নাম 'এপিফাইসিয়াল প্লেট', দুপাশে বাড়তে থাকে। এই নতুন তৈরী তরুনাস্থির ওপর বিভিন্ন লবণ জমা পড়ে তৈরী হয় নতুন অস্থি—এইভাবে হাড় বেড়ে চলে। মেরুদণ্ডের বাড় বৃদ্ধির ব্যাপারটাও তাই। মেরুদণ্ডের প্রতিটি অংশ বা কশেরুকার মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। প্রতিটি ফাঁক—তরুনাস্থির আবরণীতে ঢাকা। তরুনাস্থি বাড়লে প্রতিটি ফাঁকের মাপও বাড়বে—সামগ্রিকভাবে বাড়বে মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্যও।

প্রশ্ন আসতেই পারে—এভাবে তরুনাস্থি বাড়তে থাকলে মানুষ তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লম্বা হতেই থাকবে? বাস্তবে অবশ্য তা হয় না, 'এপিফাইসিয়াল প্লেট' অবশেষে হাড়ের মূল অংশ বা 'শ্যাফটের' সঙ্গে জুড়ে যায় বাইশ তেইশ বছর বয়সে। এই ঘটনা ঘটানোর জন্য দায়ী অ্যানড্রোজেন জাতীয় যৌন হরমোন,এবং একবার 'এপিফাইসিয়াল প্লেট' বন্ধ হয়ে গেলে সেই হাড়ের বাড়বৃদ্ধিও সেইখানেই শেষ…।

যৌন হরমোনের পরিমাণের তারতম্যের সাথে লম্বা বা বেঁটে হওয়ার এক সুস্পষ্ট যোগাযোগ লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেসব বংশগত অসুখে যৌন হরমোন তৈরী হয় বেশী, সেক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি জনিত শারীরিক বিকাশও হয় কম বয়সে, অ্যানড্রোজেনের প্রভাবে 'এপিফাইসিয়াল প্লেট' বন্ধ হয় চটপট। ফলে তাদের উচ্চতা স্বাভাবিক গড় উচ্চতার থেকে হয় অনেক কম। তেমনি আবার যেসব বংশগত রোগে যৌন হরমোনের পরিমাণ থাকে কম, সে সব ক্ষেত্রে এপিফাই-সিয়াল প্লেটও বাড়তে থাকে বেশীদিন, ফলে তাদের হাত বা পায়ের মাপও হয় অস্বাভাবিক বড়, কিন্তু চেহারা থাকে রোগা কাঠির মতো। একইভাবে বলা যায়, অ্যানড্রোজেন কম থাকার দরুন পুরুষোজনোচিত কোমর বা কাঁধের মাপে কখনই এরা পৌঁছায় না।

আপাতভাবে মনে হতে পারে বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেরা লম্বায় বাড়ে বেশী। হাল আমলে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ধারণাটা সঠিক নয়। এই সময়ে মেয়েদের গড়ে উচ্চতা বাড়ে ৮ ইঞ্চি, যেখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে গড়টা ১০ ইঞ্চি—অর্থাৎ তফাত মাত্র দু ইঞ্চির। সমীক্ষায় দেখা গেছে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে মেয়েদের লম্বা হবার হার তুলনামূলকভাবে কম। শুধু তাই নয়, মেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময়টা আসে ছেলেদের তুলনায় একটু আগে। এছাড়া মেয়েদের শরীরে অ্যানড্রোজেন জাতীয় হরমোনের পরিমাণ ছেলেদের তুলনায় অনেক কম—ফলে মেরুদণ্ডের বৃদ্ধিও তাদের কম।

বংশগতির ধারক ও বাহক যে 'জীন' তাদের মধ্যে যদি গঠনগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন দেখা যায়, অনেক সময় তার প্রতিফলন পাওয়া যায় উচ্চতার পরিমাপে। এটা জানা আছে 'জীন'গুলো পুঁতির মালার মতো সাজানো থাকে ক্রোমোসোমে, যাদের আবার খুঁজে পাওয়া যাবে কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের মধ্যে। মানুষের ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে দুটি মাত্র 'যৌন ক্রোমোসোম'—অর্থাৎ তারা ঠিক করে জাতক পুরুষ অথবা স্ত্রী হবে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোসোম দুটি সমগুণ সম্পন্ন বা XX। ছেলেদের ক্ষেত্রে দুটি ক্রোমোসোম আলাদা—XY। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এ দুটি ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি বাড়তি যৌন ক্রোমোসোম কোষে থাকছে, পরিভাষায় XXX, XXY বা XYY। এরকম বাড়তি যৌন ক্রোমোসোম-বিশিষ্ট ছেলে বা মেয়েরা অস্বাভাবিক লম্বা হবে—কমপক্ষে ১৭৫ সেন্টিমিটার। অবশ্য এ ধরণের ঘটনা চট করে চোখে পড়ে না—গড়পড়তা হাজার জনে একজন মাত্র।

অবশ্য শুধু যৌন ক্রোমোসোমই নয়, অন্যান্য ক্রোমোসোম বাড়তি বা বিকৃত থাকলে উচ্চতার তারতম্য হবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ২১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ৩ বা ১ নম্বর ক্রোমোসোমের গঠনে গোলমাল থাকলে শিশুটি খর্বাকায় হবেই। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলো

অবস্থাতেই শিশু কয়েক সপ্তাহের বেশী বাঁচে না।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, পুষ্টির সঙ্গে উচ্চতার সম্পর্কটাও কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিশুরা যখন লম্বায় বাড়তে থাকে তাদের সেই সময় বাড়তি প্রোটিনের প্রয়োজন। ইটের ওপর ইট সাজিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি হয়, প্রোটিনও সেইরকম 'অ্যামিনো অ্যাসিডের' সমষ্টিতে তৈরি। দেখা গেছে ২৫ রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ১০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড খাবারের মাধ্যমে দিতে হবে। —বাকি ১৫টি, অন্যান্য উপাদান থেকে শরীর তৈরি করে নিতে পারে। দেখা গেছে ঐ দশটি অত্যাবশ্যকীয় 'অ্যামিনো অ্যাসিডের' মধ্যে দুটির সঙ্গে উচ্চতার সরাসরি যোগাযোগ আছে। এগুলি হচ্ছে লাইসিন ও মিথিওনিন। বিকল্প প্রোটিন হিসেবে আজকাল অনেক বাড়িতেই সোয়াবীনের প্রচলন হয়েছে। শিশুদের প্রোটিনের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে কিন্তু সোয়াবীন অক্ষম—এতে প্রয়োজনের তুলনায় মিথিওনিনের পরিমাণ কম। স্বাভাবিক ভাবে লম্বা হবার জন্য পরিপূরক হিসেবে বাচ্চাদের রোজ অন্ততঃ এককাপ দুধ দেওয়া উচিত। দেখা গেছে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মাছ-মাংস খাবার প্রচলন কম, পুষ্টির যোগান আসে বেশির ভাগটা তেল বা ঘি থেকে। এসব ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার হয় মন্থর, কারণ তেল, ঘি ভেঙ্গে তৈরি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কি না রক্তে 'গ্রোথ হরমোনের' পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তেমনি আবার অতিরিক্ত মিষ্টিও বাচ্চাদের পক্ষে ভাল নয়, এক্ষেত্রেও রক্তে গ্রোথ-হরমোনের পরিমাণ কমতে পারে।

শুধুমাত্র কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা ফ্যাটই নয়, বাচ্চারা যাতে ঠিকমতো বেড়ে ওঠে, এর জন্য কিছু কিছু খনিজ লবণ এবং ভিটামিনেরও প্রয়োজন আছে। লম্বা হওয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক আছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের। খাবার থেকে রক্তে যে খনিজ লবণ শোষিত হয়, সেখানে আবার কিছু কিছু ভিটামিনের ভূমিকা আছে, যেমন ভিটামিন-ডি। তেমনি আবার হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-সি'র ভূমিকাও অনেকখানি।

যথাযথভাবে যাতে বেড়ে ওঠে তার জন্য ছোট বাচ্চাদের তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখার যে রেওয়াজ সাবেককাল থেকে চলে আসছে, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি আছে। সূর্যের আলোর প্রভাবে চামড়ার সেভেন-ডিহাইড্রো-কোলেষ্টেরল রূপান্তরিত হয় 'ভিটামিন-ডি'র পূর্বসূরী 'ভিটামিন-ডি-থ্রি তে'। এই 'ভিটামিন ডি-থ্রি' প্রথমে যকৃত এবং পরে কিডনীর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে 'ডাইহাইড্রোকোলেক্যালসিফেরল' বা ভিটামিন-ডি। দেখা গেছে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমা বা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন-ডি তৈরি হওয়া কমে বা বাড়ে। অনেক উৎসাহী বাবা-মা হয়তো ভাবতে পারেন ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম যখন লম্বা হতে এতটা সাহায্য করে, বাইরে থেকে ট্যাবলেট হিসেবে তা খাওয়ালে ক্ষতি কি? অবশ্য বাস্তবে যদি তাই হতো, তাহলে খর্বকায় যাঁরা, তাঁদের কি আর চিন্তা থাকতো? সাধারণভাবে খাবারের সঙ্গে যতটা ক্যালসিয়াম আমাদের পেটে যায়, তার পঁচিশ শতাংশ মাত্র রক্তে মেশে স্বাভাবিক অবস্থায়। বাকিটা স্রেফ নষ্ট। কতটা ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস রক্তে আসবে, তা নির্ভর করে রক্তের ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের অনুপাতের ওপর। বাইরে থেকে যতই ক্যালসিয়াম দেওয়া যাক না কেন, খরচের অঙ্কটাই শুধু বাড়বে। তেমনি আবার খাবারের বিশেষ বিশেষ উপাদান ক্যালসিয়াম বা ফসফরাসকে রক্তে মিশতে বাধা দেয়। যেসব খাবারে অক্সালিক অ্যাসিড বেশি, যেমন লেটুস, আপেল, কিংবা শস্যজাতীয় খাদ্যের 'ফাইটিক অ্যাসিড' অথবা বেশি পরিমাণে তেল বা ঘি—এরা ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। তেমনি আবার প্রোটিন জাতীয় খাবার, বিশেষতঃ যাতে লাইসিন বা আর্জিনিন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি, যেমন দুধ, মাছ বা সয়াবীন, এদের উপস্থিতিতে ক্যালসিয়াম রক্তে মেশে চটপট।

ভিটামিনের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তার থেকে কিন্তু নানা বিপত্তি আসতে পারে, বিশেষতঃ ভিটামিন-এ বা ভিটামিন-ডি'র

ক্ষেত্রে। শরীরে প্রয়োজন যতটা খনিজ লবণ বা ভিটামিন, তা বাচ্চারা জোগাড় করে নেয় তাদের স্বাভাবিক খাবার-দাবার থেকেই। বাড়তি পরিমাণটুকু যোগানোর জন্য একটু দুধ, ডিম বা শাকসব্জিই যথেষ্ট। এর সঙ্গে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে খোলামেলা জায়গায় তারা যেন একটু খেলাধুলো করতে পারে! আমাদের দেশে যাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, দেখা গেছে তাঁদের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মের প্রথম বছর গুলোতে লম্বায় বাড়ে কম। অনেক পুষ্টি-বিজ্ঞানীরই ধারণা, অনাবশ্যকভাবে তাদের বারবার খাওয়ানোর চেষ্টা বা স্বাস্থ্যের প্রতি বাবা-মার অনেক সময় অতিরিক্ত যত্নই বোধহয় এর একটা বড় কারণ। আজকাল তাই বলা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিকভাবে লম্বা হতে দিন। শুধু লক্ষ্য রাখুন তারা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে কি না। বংশগতির ধারাই ঠিক করবে তার উচ্চতা শেষমেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে বরং দু-একটা পরিসংখ্যানের কথা বলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী রবার্ট ওয়ার্ডলো জন্মেছিলেন ১৯১৮ সালে। মাত্র পাঁচ বছরে তার উচ্চতা দাঁড়ায় পাঁচ-ফুটে, আটবছরে ছ-ফুট, পনেরো বছরে সাতফুট-আট ইঞ্চি এবং বাইশ বছরে আটফুট-এগারো ইঞ্চি! অবশ্য ওয়ার্ডলো বাঁচেন নি বেশিদিন। বাইশ বছর বয়সে পায়ে 'সেপটিক সেলুলাইটিস' হয়ে মারা যান তিনি। এ শতকে এখন পর্যন্ত এটাই লম্বা হওয়ার বিশ্ব-রেকর্ড। এখন পর্য্যন্ত যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের মধ্যে লম্বায় ফার্স্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডন কোহেলার—আটফুট দু-ইঞ্চি। লম্বার পাল্লায় মহিলারাও কেউ কেউ নেহাত খাটো নন। এ শতাব্দীর দীর্ঘতমা মহিলা স্যাণ্ডি অ্যালেনের জন্ম ১৯৫৫ সালে, এখন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে কর্মরতা! উচ্চতা সাতফুট সোয়াসাত-ইঞ্চি! জুতোর মাপ—২২!

পরিবেশ কি মানুষকে লম্বা করে ?

"জন্মিলে মরিতে হবে—অমর কে কোথা কবে ?" বস্তুতপক্ষে, জন্ম এবং মৃত্যু, এ দুটি জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও, বৃদ্ধি বা 'গ্রোথের' কথা না ভেবেও উপায় নেই, কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু—যাত্রার শুরু থেকে শেষ, এই যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে বৃদ্ধির পথ ধরেই।

অবশ্য বৃদ্ধির কথা বললে কেউ যেন না শুধুমাত্র উচ্চতার কথাই ভেবে বসেন, কারণ শরীরের বাড়বৃদ্ধি, দৈর্ঘ্য কিংবা প্রস্থ, যে কোন দিকেই হতে পারে। উচ্চতা—বৃদ্ধির একটা 'ডাইমেনশন' বা পরিমাপ মাত্র। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ডাইমেনশনটি সম্বন্ধেই আমাদের চিন্তাভাবনা বেশি, বিশেষতঃ কিছু কিছু চাকরি, খেলাধুলো বা বিয়ের বাজারে তো বটেই !

লম্বা বা বেঁটের ব্যাপারে বংশগত ধারা একটা আছে ঠিকই, কিন্তু কার উচ্চতা কতটা হবে সেটা কি শুধুমাত্র এই বংশগতির ধারার ওপর নির্ভর করে ? আজকের দিনে পরিবেশেরও এ ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত। এ প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানগুলির নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক সমঝোতা আছে। অর্থাৎ, মনে করুন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যে সব ছেলেমেয়ে জন্মেছে এবং তাদের যে ধরনের রোগভোগ হচ্ছে, শীতপ্রধান দেশের ছেলে-মেয়েদের রোগভোগের থেকে তাদের ধরনধারন আলাদা। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর রোগ আক্রমণের ধরনধারন নির্ভর করবে। তেমনি আবার কে যে রোগভোগের কবলে পড়বে চট্ করে তা নির্ভর করছে তার সাধারণ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ওপর, যা কি না আবার নির্ভর করবে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন বা কৃষ্টিগত পটভূমির ওপর। এদের মধ্যে

প্রতিটি আবার জাতিভেদ বা ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের তুলনায় আলাদা। শুধু তাই নয়, বংশানুগত চরিত্রভেদে প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে একই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন ভাবে বিক্রিয়া করবে, ফলে একই জাতি, একই ধর্ম, একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত, এমন কি একই বংশের দুজনের উচ্চতার ওপর প্রাকৃতিক প্রভাব পড়বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

প্রথমে বরং জাতিভেদের কথাতেই আসা যাক্। জাতিভেদে যে উচ্চতার হেরফের হয়, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ তফাতটা বেশ ভাল চোখে পড়বে কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের দেখলেই। শহরে টুরিষ্ট হিসেবে একদল ইউরোপীয় বা মার্কিন ছেলেমেয়ে, মোটামুটি বয়স সতের থেকে বাইশ-তেইশ, তাদেরই শহর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সমবয়সী একজন ভারতীয় ছেলে বা মেয়ে – এ দৃশ্য কলকাতা, দিল্লী বা বোম্বাইতে অপরিচিত নয় মোটেই। এ সব ক্ষেত্রে উচ্চতার ফারাকটাও চোখে পড়ে চট করে। আসলে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উচ্চতা বাড়তে থাকে বাইশ কি চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত, অন্ততঃ আমাদের দেশে তো বটেই। কিন্তু অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে ছেলে মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ উচ্চতা কিন্তু আরও আগেই চলে আসে, আঠারো থেকে বিশ বছরের মধ্যেই। এর সঙ্গে বংশানুগত পার্থক্য তো আছেই।

ইউরোপীয় মহাদেশে জাতি হিসেবে নরওয়ের মানুষেরা সব থেকে লম্বা—গড় উচ্চতা ১৭৭.৭ সেমি.। আবার ইউরোপীয়দের মধ্যে সব থেকে কম উচ্চতা রুমানীয়দের ; গড়—১৬৮.৭ সেমি.। রুমানীয়রা যদিও ইউরোপের বাসিন্দাদের মধ্যে সব থেকে কম উচ্চতা সম্পন্ন ,কিন্তু এদের গড় উচ্চতা যে কোন পাকিস্তানী বা ভারতবাসীর থেকে বেশি। এশিয়ার মধ্যে গড়পড়তা উচ্চতা সব থেকে বেশি পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীদের। সেখানকার প্রায় এক হাজার জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উচ্চতার সমীক্ষায় গড় দাঁড়িয়েছে ১৬৮.৬ সেমি.। এই তুলনায় বাঙালীদের গড় উচ্চতা ১৬২.৬ সেমি.।

সুতরাং উচ্চতা নিয়ে গর্ব করা আমাদের সাজে না।

উচ্চতার পরিমাপে সব থেকে ওপরে আছে সুদানের 'ডিংকা' গোষ্ঠী—গড় উচ্চতা ১৮১.৬ সেমি.। অপর দিকে গোষ্ঠী বিচারে সব থেকে বেঁটে কংগোর 'মবতু' উপজাতির পিগমিরা, ১৩৮ সেমির ওপর কারো উচ্চতা এখনও দেখা যায় নি।

কোন্ বয়সে ছেলে-মেয়েরা কি হারে লম্বা হয়, এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কয়েক বছর আগে—বিজ্ঞানী ইভেলিথ এবং বিজ্ঞানী ট্যানারের নেতৃত্বে। তাঁরা দেখেছেন জন্মের প্রথম দু-বছরের মধ্যে চট্ করে বেড়ে যাবার পর থেকে বারো কি তের বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতা বাড়তে থাকে ঢিমে তালে, কিন্তু সমান লয়ে। এর পরেই উচ্চতা চট্ করে যায় বেড়ে—এর সঙ্গে আসে গোঁফ দাড়ি, গলার স্বরের তারতম্য ও নানা শারীরিক পরিবর্তন। এই যে কৈশোর থেকে যৌবরাজ্যে অভিষেক, তার সময়টা মোটামুটি ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা বা আফ্রিকাতে একই। চীন মহাদেশে সময়টা আসে একটু পিছিয়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কিশোর-কিশোরীদের গড় বয়সের তুলনায়—গড়ে মাস আটেক পিছিয়ে। এছাড়া দুই থেকে চৌদ্দ—এই সময়টার মধ্যে চীন বা জাপানে উচ্চতা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয়দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্থর, কৈশোর আর যৌবনের মাঝখানের সময়টাও তুলনামূলকভাবে ক্ষণস্থায়ী। বিজ্ঞানী হাসপি 'বাঙালী ছেলে-মেয়েদের' ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন গত ১৯৮০ সালে। তাঁর মতে বাঙালী ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময়টা আর পাঁচটা ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের মতই। কিন্তু বয়ঃসন্ধির আগের যে বৃদ্ধি, তার গতি অনেক শ্লথ। সুতরাং পূর্ণবয়স্ক একটি বাঙালী ছেলে বা মেয়ের গড় উচ্চতা কম হওয়ার কারণই হচ্ছে জীবনের প্রথম বছরগুলিতে বেড়ে ওঠার গতির মন্থর হার।

অনেকে হয়তো লক্ষ্য করেছেন, কিছু কিছু লোককে একনজরে দেখেই মনে হয়—ভদ্রলোক কি লম্বা! আবার একই উচ্চতার অপর

একজন, তাঁকে দেখে হয়তো চট্ করে বোঝা যায় না সঠিক উচ্চতা কত। এই ধরনের ব্যাপার ঘটে বেশি তাঁদেরই ক্ষেত্রে যাঁদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দুটোই মানানসই! আসলে কে কতটা লম্বা তা একনজরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাত বা পায়ের দৈর্ঘ্য—গোটা মানুষটা নয়। খেলার মাঠে বা টিভির কল্যাণে অনেকেই হয়তো দেখেছেন ক্রিকেটের আসরে অষ্ট্রেলীয় বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের বিপক্ষের তুলনায় যেন দৈত্যাকার মনে হয়। এখানেও রহস্যটা একই, প্রথম বয়সে সামগ্রিকভাবে শরীরের বৃদ্ধির তুলনায় পায়ের দৈর্ঘ্য বাড়ে বেশি। চীনদেশের লোকেদের বেঁটে বদনামের পেছনে কারণটাও তাই, গোটা শরীরের তুলনায় পায়ের বৃদ্ধির হার ঢিলেঢালা। অথচ নিতম্ব-সন্ধির বেড় বা দুই কাঁধের মধ্যেকার দূরত্ব অধিকাংশ ইউরোপীয় এবং চীনাদের প্রায় সমান!

বছর কয়েক আগে জনষ্টন নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী উচ্চতা এবং ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না তাই দেখার জন্য এক পরীক্ষা চালান। পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তিন দল ছেলেমেয়েদের ওপর—যাদের সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ পরিবারের লোকসংখ্যা, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি মোটামুটি একই ধরনের। প্রথম দলের ছেলেমেয়েরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছে এবং সেখানেই বড় হচ্ছে, দ্বিতীয় দলের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু বসবাস মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালায়, এবং তৃতীয় দলের জন্ম ও বসবাস দুই-ই গুয়াতেমালায়। এদের বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করে দেখা গেল যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছে অথচ গুয়াতেমালায় বড় হচ্ছে, তাদের জীবনের প্রথম বছরগুলিতে বৃদ্ধির হার, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা বড় হচ্ছে, তাদের বৃদ্ধির তুলনায় অন্যরকম। অথচ যে শিশুটি গুয়াতেমালায় জন্মেছে তার প্রথম বয়েসে বৃদ্ধির হার এবং গুয়াতে-মালায় বসবাসকারী মার্কিন শিশুদের বৃদ্ধির হার একইরকম। অথচ বয়ঃসন্ধির সময়টা এদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। আবার জন্মসূত্রে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা গুয়াতেমালা,

যেখানেই বড় হোক না কেন তাদের বয়ঃসন্ধির সময়টা একই থাকছে। সুতরাং এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে জন্মের পর প্রথম বছরগুলিতে বৃদ্ধির হার নির্ভর করবে ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর, কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় যে উচ্চতা বাড়ছে তার সময় ও স্থায়িত্ব পুরোপুরিভাবে বংশগতির প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ যে উচ্চতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার চমৎকার উদাহরণ দেখা যায় পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে পরিবেশ বসবাসের প্রতিকূল। ক্রান্তীয় অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন, অর্থাৎ সূর্যের তাপ যেখানে বেশি সেখানকার মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই রোগা এবং লম্বাটে চেহারার ; আবার যাঁরা মেরুঅঞ্চলে বরফের রাজ্যে বাস করেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই একটু গোলাকৃতি ও খর্বকায়। উচ্চতা এবং গঠনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ একই–প্রথম ক্ষেত্রে এ ধরনের চেহারা শরীর থেকে তাপ বর্জনে সহায়তা করবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা হবে তাপবর্জনের পরিপন্থী। এছাড়াও দেখা গেছে যাঁরা উচুঁ পাহাড়ী এলাকায় জন্মেছেন এবং সেখানেই বসবাস করছেন, তাঁদের জীবনের প্রথম বছরগুলিতে লম্বা হবার হার অপেক্ষাকৃত মন্থর। এ ঘটনার উদাহরণ হিসেবে 'শেরপাদের' নাম করা যেতে পারে, হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে যাদের বসবাস। কয়েক বছর আগে পেরুর 'কুইচা'দের বাড়বৃদ্ধির হার নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, সে রিপোর্টেও একইরকম বক্তব্য পাওয়া গেছে। বাতাসে অক্সিজেনের চাপের হেরফেরের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে আছে বলে অনেক বিজ্ঞানীরই ধারণা।

কে কতটা লম্বা–মূলতঃ সেটা বংশগতির সূত্রে নির্ধারিত হলেও সামাজিক পরিবেশও তার বেশ কিছুটা হেরফের ঘটাতে পারে। গত দশকে ব্রিটেনে এক 'জাতীয়' সমীক্ষা হয়েছিল 'স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি' নিয়ে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮—এই সময়ের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন পুষ্টিবিজ্ঞানী অভিমত দিয়েছেন যে বাবা-মা'র মাসিক আয়ের সঙ্গে সন্তানের উচ্চতার একটা সম্বন্ধ আছে। দেখা গেছে একই পরিবেশে

মানুষ হচ্ছে এই রকম বাচ্চাদের মধ্যে যে সব বাচ্চার বাবা-মা'র মাসিক আয় ওপরের দিকে, তাদের উচ্চতা গড়পড়তা অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় সামান্য বেশি! ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বিজ্ঞানী মিলার লিখছেন—শুধুমাত্র পারিবারিক আয়ই নয়, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত, তারও বাচ্চার উচ্চতার ওপর প্রভাব থাকতে পারে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের উচ্চতা মেপে তিনি দেখিয়েছেন যে সব ছেলেমেয়ে বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান, তাদের গড় উচ্চতা অন্যান্য বাচ্চাদের অর্থাৎ যারা একাধিক ভাইবোনের মধ্যে মানুষ হচ্ছে তাদের তুলনায় গড়ে আড়াই থেকে চার-সেন্টিমিটার বেশী! শুধু তাই নয়, ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বাচ্চারা যে পরিবেশে বাস করছে তার লোকসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে বাড়বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। শহরের জনবহুল পরিবেশে যারা মানুষ হচ্ছে, তাদের গড় উচ্চতা শহরের বাইরে খোলামেলা পরিবেশে মানুষ হওয়া বাচ্চাদের তুলনায় কম। কেবলমাত্র ব্রিটেনেই নয়, একইধরণের রিপোর্ট পাওয়া গেছে গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলো থেকেও! যদিও অস্ট্রেলীয় বা মার্কিন বিজ্ঞানীরা পরিবেশের লোকসংখ্যা এবং বাচ্চাদের বৃদ্ধির হারের মধ্যে আপাতভাবে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাননি। সুতরাং এ তথ্যটি আরো বিশদভাবে সমীক্ষা করার দরকার আছে। তবে বিভিন্ন রোগভোগের সঙ্গে যে বাচ্চাদের লম্বা হওয়ার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, তা সব দেশের বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেন। এইসব রোগের মধ্যে শ্বাসঘটিত নানা অসুখবিসুখ এবং ভিটামিনঘটিত অপুষ্টিই প্রধান। সুতরাং কে কি হারে লম্বা হবেন সেটা প্রাথমিকভাবে বংশগতির ধারায় নির্ধারিত হলেও পরিবেশ তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। ভৌগোলিক ও সামাজিক—এই দুই পরিবেশের পারস্পরিক বিক্রিয়াই ঠিক করবে বংশগতির ধারায় পাওয়া উচ্চতার সঙ্গে কত সেন্টিমিটার জোড়া হবে বা তার থেকে কতখানি কাটা হবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে!

লম্বা হবার সহজ উপায়

মাত্র দু-ইঞ্চির জন্য হল না। —আক্ষেপ করে কথাটা বলছিলেন বন্ধুবর। এমন একটা চাকরি হাতে এসেও ফস্কে গেল স্রেফ মাথায় দু-ইঞ্চি খাটো হবার জন্য।

এ আক্ষেপ শুধু আমার বন্ধুবরেরই নয়, উচ্চতায় যাঁরা কিঞ্চিত খাটো অনেকের ক্ষেত্রেই বোধহয় খেটে যায় এ-কথা। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানেন? যে সময় চেষ্টা করলে খানিকটা হয়তো লম্বা হওয়া যায়, আমাদের তাগিদটা আসে সে সময়টা পার করে দিয়ে। কেউ যদি সত্যি সত্যিই মাথা চাড়া দিতে চান, প্রচেষ্টা চালাতে হবে আট নয় থেকে শুরু করে ষোলো-সতের বছর বয়স পর্য্যন্ত। বিশ বছরের মধ্যে মোটামুটি শরীরের হাড়গোড় সবই যা বাড়ার বেড়ে বসে থাকে। এরপর হাজার টানাটানিতেও বাড়বে না একচুল। শুনে হতাশ হচ্ছেন নিশ্চয়? না—একেবারে হতাশ হবেন না, শরীরের কাঠামো বাড়ানো না গেলেও কাঠামোর মাঝে মাঝে ফাঁকগুলো বাড়ানো যেতে পারে নিশ্চয়—বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের কশেরুকার মাঝের ফাঁকগুলো। ছাব্বিশটা কশেরুকার প্রতিটি ফাঁক দু-মিলিমিটার বাড়াতে পারলেও আপনার নীট উচ্চতা বাড়বে দু-ইঞ্চি! কিন্তু সেই শেষ চেষ্টা করার আগে বরং আসুন দেখা যাক ছোট বয়সে আমরা উচ্চতা বাড়ানোর জন্য কি করতে পারি!

বয়সের তুলনায় বৃদ্ধির হার কম কি বেশি, তা বোঝার সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে নিয়মিতভাবে উচ্চতা ও ওজনের হিসেব রাখা। বাঙালী ছেলেমেয়েদের বয়স এবং উচ্চতার গড়পড়তা হিসেবটা হলো এরকম:—

বয়স (বছর)	উচ্চতা ছেলে	উচ্চতা মেয়ে
৮	৪ ফুট ০ ইঞ্চি	৪ ফুট ০ ইঞ্চি
৯	৪ " ২ "	৪ " ১ "
১০	৪ " ৪ "	৪ " ২ "
১১	৪ " ৬ "	৪ " ৪ "
১২	৪ " ৮ "	৪ " ৫ "
১৩	৪ " ১০ "	৪ " ৭ "
১৪	৫ " ১ "	৪ " ১০ "
১৫	৫ " ৩ "	৫ " ০ "
১৬	৫ " ৫ "	৫ " ১ "

বয়সের সঙ্গে তারা ঠিকমতো বেড়ে উঠছে কি না, এই তালিকা থেকে তার একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। ছোট বয়সে কে কি হারে বেড়ে উঠবে তা অনেকটাই নির্ভর করে 'পিটুইটারী' গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা 'গ্রোথ-হরমোনের' পরিমাণের ওপর। সুতরাং প্রত্যেকেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার 'পিটুইটারী' থেকে কিভাবে বেশি পরিমাণে 'গ্রোথ-হরমোন' আদায় করে নেওয়া যায়। এই হরমোনের প্রভাবে হাত এবং পায়ের দৈর্ঘ্য বাড়বে। এছাড়া, সাধারণ কয়েকটি অভ্যেসের কথা মনে রাখা যায় যাতে মেরুদণ্ডের ওপর অযথা চাপ না পড়ে বা যদি সামান্য কয়েকটা ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়ামের সাহায্যে আমরা মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করি, তাহলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কশেরুকার মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি বাড়বে যথাযথভাবে যা কিনা উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে যোগাবে।

প্রথমে বরং দেখা যাক 'গ্রোথ-হরমোন' আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি। খাবার নিয়ে বাচ্চাদের বাছবিচার যত কম থাকে ততই মঙ্গল—এ ধরনের ধারণা থাকলেও লম্বা হবার ব্যাপারে কেউ যদি সত্যিই আগ্রহী হন তাহলে কিছু কিছু বাছবিচার মানাই বোধ হয় ভাল। বাচ্চাদের অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি বা তেল-ঘি দেওয়া

চলবে না। এগুলি পিটুইটারী থেকে স্বাভাবিক পরিমাণে 'গ্রোথ-হরমোন' নিঃসরণ কমায়। সারাদিনের খাবারে একভাগ প্রোটিন, একভাগ ফ্যাট এবং অন্ততঃ চারভাগ শ্বেতসার অর্থাৎ ভাত-রুটি-সুজি ধরনের খাবার থাকবে। তেল বা ঘি খেয়ে ছোট বয়সেই যদি শরীরে অযথা চর্বি জমে, 'গ্রোথ-হরমোন' তার স্বাভাবিক কাজকর্মও ঠিকমতো করতে পারবে না। লেটুস বা পিঁয়াজ—এই ধরনের অক্‌জালেট যুক্ত খাবার বাচ্চাদের কম দেওয়াই ভাল, কারণ এরা অন্ত্র থেকে রক্তে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। বাচ্চাদের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, সকালবেলা সামান্য ছোলা-গুড় খাওয়ানো অভ্যেস করা যেতে পারে, প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাতে এরা খুব ভাল কাজ করে। খুব ছোট বাচ্চাদের ক্ষিদে বাড়ানোর জন্য যে সব 'বেবী ড্রপ' ব্যবহার করা হয়, ছেলেমেয়েদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত তা দেওয়া যেতে পারে। এ সব ড্রপে সাধারণতঃ 'লাইসিন' বা 'আর্জিনিন' ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড মেশানো থাকে যা একাধারে ক্ষিদে বাড়াবে, অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করবে এবং রক্তে গ্রোথ-হরমোনের পরিমাণ বাড়াবে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে সব বাচ্চারা বছরের বেশির ভাগ সময়টাই সর্দিজ্বরে ভোগে, তাদের গড় বৃদ্ধির হার অন্য পাঁচটা স্বাভাবিক বাচ্চার তুলনায় কম। এছাড়া, আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও আকছার 'স্টেরয়েড' জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় যাতে সর্দি-কাশি বা জ্বরের থেকে তারা চট্ করে সেরে উঠতে পারে। দেখা গেছে 'কর্টিসন' গোত্রের স্টেরয়েডরা গ্রোথ-হরমোনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক বাবা-মা'র ধারণা, যে সব বাচ্চা গলার টনসিলের অসুবিধেতে ভোগে, টনসিল অপারেশন করালে তারা লম্বা হবে চটপট। এ ধারণার পেছনে বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি দাঁড় করানো শক্ত। কারণ, টনসিল প্রকৃতপক্ষে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অবশ্যক 'সেপটিক টনসিল' বা ঐ ধরনের কোন অসুখে টনসিলের জন্যে মায়া-মমতা না করাই ভাল।

এবার বরং আসা যাক ব্যায়াম প্রসঙ্গে। ব্যায়াম করে লম্বা হওয়ার চেষ্টা সব থেকে ফলপ্রসূ হয় ছোটবেলা থেকে অভ্যেস করলে। পূর্ণ-বয়স্ক যাঁরা, অর্থাৎ তেইশের ওপর বয়স, ব্যায়াম করলে তাঁদেরও উচ্চতা বাড়বে নিশ্চয়, অবশ্য তা দেড় বা দু-ইঞ্চির ওপর নয়।

সঠিকভাবে ব্যায়াম করলে যে শুধু উচ্চতা বাড়ে তাই নয়, কেউ কেউ নিজের ইচ্ছেমতো উচ্চতা কমাতে-বাড়াতেও পারেন। এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড আছে মার্কিন নাগরিক ক্লিয়ারেন্স উইলার্ডের। উইলার্ডের স্বাভাবিক উচ্চতা ছিল পাঁচফুট দশ ইঞ্চি। নিজের ইচ্ছামতো অস্থিসন্ধিগুলি সম্প্রসারিত করে তিনি একফুট পর্যন্ত উচ্চতা বাড়াতে পারতেন। স্রেফ এই একটি বিশেষ গুণের জোরে এক সার্কাসের দলে তাঁর জায়গা ছিল বাঁধা।

কয়েকটি ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম—যেমন হাঁটু না ভেঙ্গে বসে বা দাঁড়িয়ে হাতের তর্জনী দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়া, হাত পেছন দিকে বাঁকিয়ে হাত এবং পায়ের সাহায্যে আর্চ করা বা 'পীকক' —এগুলি লম্বা হওয়ার সহায়ক। তবে একই সঙ্গে বিভিন্ন অন্তক্ষরা গ্রন্থির কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানো এবং কাঠামোর বিভিন্ন অংশে ছেদ বাড়াতে যৌগিক ব্যায়াম সত্যিই ভাল কাজ করে। যাঁরা এই যৌগিক ব্যায়াম বা আসন চর্চা করেন, তাঁদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা—উষ্ট্রাসন, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, সর্বাঙ্গাসন, ধনুরাসন বা শশঙ্গাসন লম্বা হতে সাহায্য করে। আসলে এসব আসনগুলি বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতে রক্ত চলাচল বাড়ায় এবং নানা সন্ধির ওপর চাপ দিয়ে তাদের মধ্যেকার ছেদগুলি বাড়তে সুযোগ দেয়। তবে আসন করার নির্দিষ্ট কতকগুলি পদ্ধতি আছে এবং সেগুলি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চর্চা করাই যুক্তিযুক্ত। অনেকের ধারণা—প্যারালাল বার বা রিংয়ে ব্যায়াম করলে লম্বা হওয়া যায়। এ ধারণার কিন্তু কোন ভিত্তি নেই, এইগুলি মূলতঃ হাত বা পায়ের পেশী গঠনে সাহায্য করে।

তবে লম্বা হওয়ার ব্যাপারে সব থেকে বড় প্রভাব নিঃসন্দেহে

বংশগতির। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এক্ষেত্রে মেণ্ডেল সাহেবের সূত্র যদি অনুসরণ করা যায়, তবে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যে পরিবারের ইতিহাসে বংশানুক্রমে লম্বা ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে পাত্র-পাত্রী পছন্দ করতে পারলে ভাল। ভবিষ্যতে বংশ-ধরদের মাথায় খাটো হবার সম্ভাবনা তাতে অনেকাংশেই কমে।

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে লম্বা হবার সত্যিই ইচ্ছে থাকলে, সবটা না হলেও, খানিকটা উচ্চতা বাড়ান মোটেই কঠিন নয়, অবশ্য যদি না বংশানুঘটিত উচ্চতার অস্বাভাবিক হেরফের থাকে।

আর এত কিছু করার পরও যদি কেউ বলেন—এক ইঞ্চির জন্য চাকরিটা হলো না, চুপি চুপি তাঁদের বলে রাখি, ভবিষ্যতে উচ্চতা মাপবার আগে বেশ কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে তবে যাবেন। ঘুম থেকে ওঠার ঠিকপরেই উচ্চতাস্বাভাবিকের তুলনায় ইঞ্চিখানেক বেশি থাকে। এর পেছনেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে—যে কোন দুটি অস্থিসন্ধির মাঝে বিশেষএক ধরনের তরলপদার্থ বা 'সাইনোভিয়াল ফ্লুয়িড' থাকে যা,অস্থি-দুটিকে ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। দেখা গেছে আমরা যখন বসে বা দাঁড়িয়ে থাকি, শরীরের ওজনে কশেরুকা অস্থি-সন্ধির ফাঁকগুলি যায় ছোট হয়ে। অবশ্য এ তারতম্য এতই কম যে খালি চোখে দেখলে তা বোঝা অসম্ভব। এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে শুয়ে ঘুমানোর সময়—শরীরের ওজন মেরুদণ্ডের উপর লম্ব ভাবে ক্রিয়া করে না, ফলে অস্থি সন্ধির মাঝের ফাঁকগুলি যায় বেড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ০'৫ থেকে ১ মিলিমিটার হিসেবে এই তারতম্য ঘটলে ২৫টি অস্থিসন্ধির সুবাদে মোট বৃদ্ধি দাঁড়াবে ০'৫ থেকে ১ ইঞ্চি! বলাই বাহুল্য, এই তারতম্যের জন্যে দায়ী মূলতঃ জল—যা কি না চাপের তারতম্য ভেদে অনায়াসে রক্ত থেকে অস্থিসন্ধির মধ্যবর্তী তরলে যাতায়াত করতে পারে।

এত কথার পরেও বিশ্বাস যদি না হয়, নিজেই মেপে দেখুন না একদিন!

কাদের গরম বেশি ?

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমান যন্ত্রের পারদসীমা যতই চড়তে থাকে গরমের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতিও চলতে থাকে তার তালে তাল মিলিয়ে। বাজারের লিস্টে বেল আর তরমুজ, ঘরে ঘরে নতুন মাটির কুঁজো, ছুটির দুপুরে মেঝেতে শীতলপাটি, অফিসে অফিসে গরমের বিরুদ্ধে অভিযান—সারাবছর গুটিয়ে রাখা খস্‌খসের পর্দা নেমে যায়, সকাল-বিকেল বালতি পিচ্‌কারী হাতে ওয়াটার বয়েদের যাতায়াত। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—যাদের 'স্ট্যাটাস' উঁচু, সেখানে 'এয়ার কণ্ডিশনার' চালু হয়ে যায় পুরোদমে, বাবুরা অফিসে এসেই টেবিলে পেয়ে যান বরফ ঠাণ্ডা 'কুলারের' জল।

গরমের বিরুদ্ধে আমাদের এত প্রস্তুতি, তবু দেখবেন এক শ্রেণীর মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবেই, যাঁদেরকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলে এই গরম! এঁদের মধ্যে অফিসে কাজ করা বাবুরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন পঞ্চাশ পেরোনো 'গিন্নী-মা'রা, কচি-কাঁচারাও' বাদ নেই। এরা অবিশ্রান্তভাবে ঘামছেন আর ঘামছেন। বিদ্যুৎ থাকলে ফুলস্পীডে পাখা খুলে গামছা বা রুমালে ঘাম মুছছেন। 'লোডশেডিং' হলে তো আর কথাই নেই!

আচ্ছা ভেবে দেখেছেন কি—গরমে কাবু হন কারা বেশি? একটু নজর করলেই দেখবেন, যাঁরা একটু বেশি হৃষ্টপুষ্ট, তাঁদের অবস্থা গরমে সত্যিই শোচনীয় হয়ে পড়ে, কারণ তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করে তাঁদের নিজেদেরই চামড়ার নিচে জমানো বাড়তি চর্বির স্তর। চর্বি ভেদ করে শরীরের মধ্যেকার তাপ ঠিক মত বেরিয়ে আসতে পারে না—ফলে অস্বস্তিও বাড়ে আনুপাতিক হারে। অনেকে বলেন যাঁরা বেশি মোটা, তাঁদের গরমের বোধটাও বেশি। কথাটা ঠিক নয়, কারণ শরীরের চামড়ায় তাপ গ্রহণের জন্য যে গ্রাহক কোষ থাকে তার সংখ্যা রোগা-মোটা নির্বিশেষে প্রায় একইরকম, সুতরাং তাপের বোধটাও

সকলেরই প্রায় সমান।

তাপের অনুভূতি গ্রাহককোষ বা 'থার্মাল রিসেপটার' থেকে স্নায়ু মারফত সুষুম্নাকাণ্ড বেয়ে ওঠে মস্তিষ্কে, যেখানে বিচার বিশ্লেষণ হয় তাপের অনুভূতিটা কেমন।

গ্রীষ্মের দিনগুলিতে পৃথিবীর বুকে সূর্যরশ্মি আসে সোজাসুজি বেশি পরিমাণে, তার তাপও সুতরাং বেশি। গরমের জন্য দায়ী মূলতঃ বর্ণালীর লাল অংশ যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬,২০০ থেকে ৭,৭০০ আংগষ্ট্রম একক (১ আংগষ্ট্রম = মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ)। অবশ্য এর সঙ্গে আছে সূর্যের আলোর অবলোহিত বা ইনফ্রা-রেড রশ্মি, যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭,৭০০ থেকে ১২০,০০০ আংগষ্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাপ রশ্মি এবং এরা সরাসরি ত্বকের ওপরভাগ ভেদ করে চামড়ার বেশ খানিকটা নিচে গিয়ে জায়গাটা গরম করে তোলে। শরীর চেষ্টা করে এই বাড়তি তাপটাকে চামড়া দিয়ে বাইরে ছেড়ে দিতে, কিন্তু বাদ সাধে চর্বির স্তর। বাড়তি তাপ শরীরে আটকা পড়ে। কষ্টটাও হয় বেশি। অনেকে হয়তো লক্ষ্য করেছেন, খুব ছোট বাচ্চারা গরমের দিনে অস্বাভাবিক পরিমাণে ঘামে। এ নিয়ে খুব বেশি চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ ঐ বয়সে মস্তিষ্কের 'তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' পুরোপুরি কার্যক্ষম থাকে না, ফলে অল্পেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে পড়ে শিশুদের ক্ষেত্রে—অল্প গরমেই ঘাম হতে থাকে এন্তার কিংবা সামান্য কোন কারণেই জ্বর উঠে যায় ১০২—১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে কোন কোন বাচ্চার দিনে তিন থেকে পাঁচ লিটার পর্যন্ত ঘাম হতে পারে!

কিন্তু এই যে ঘাম—এর দরকারটা কোথায়? একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, শরীরের ভেতর জমা বাড়তি তাপকে ছেড়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই ঘাম। শরীর থেকে জল বেরিয়ে তা জলীয়বাষ্পে পরিণত হতে হলে চাই তাপ, এবং এই তাপটা সংগৃহীত হয় শরীর থেকেই। হিসেব করে দেখা গেছে এক লিটার ঘামকে বাষ্পে পরিণত করতে ৬০০ ক্যালরি তাপ শরীর থেকে বেরিয়ে

যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় শরীর ঠাণ্ডা হবে তখনই যখন ঘাম বাষ্পে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তবে তাই কি সবসময় ঘটে? অবশ্যই না, কারণ আমাদের পূর্বভারতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের শতকরা ভাগ সবসময়ই বেশী। বাতাসে জলীয় বাষ্পের ভাগ বেশী থাকলে ঘামের বাষ্পায়নের হারও হবে কম। ফলে ঘামের ফোঁটা জমবে সারা শরীরে। বাষ্পায়িত হবার পরিবর্তে হয়ত বা তা টুপ করে ঝরে পড়বে ভিড়ঠাসা বাসের দাঁড়ান যাত্রীর কপাল থেকে যিনি বসে আছেন তাঁর কোলের ওপর! বাষ্পায়িত না হবার ফলে গরম তো কমলই না, উলটে এক বিশ্রী বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি!

ভেবে দেখেছেন কি—এই ঘাম আসে কোথা থেকে? উত্তরটা সোজা, চামড়ার নীচে যে অসংখ্য ঘাম-গ্রন্থি, তারা জলটা সংগ্রহ করে রক্তের থেকে। কোন কারণে ঘামের পরিমাণ যদি অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়, রক্তের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। রক্তের স্বাভাবিক ঘনত্ব বজায় রাখতে চামড়ার নিচের 'টিস্যু' এবং পেশীগুলো থেকে জল বেরিয়ে মেশে রক্তে। এই অবস্থায় তৃষ্ণার পরিমাণও বাড়ে, ফলে বাড়তি জলটুকু অন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে রক্ত মারফত আবার জমা হয় পেশী ও অন্যান্য 'রিজারভারে'। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—শুধুমাত্র জল খেলেই হবে না, কারণ ঘামের সঙ্গে আনুপাতিক হারে শরীর থেকে বিভিন্ন লবণও বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং গরমের দিনে ঘামতে ঘামতে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ার চাইতে জলে সামান্য লেবু আর নুন মিশিয়ে খেলে তার উপকারও বেশী, ক্লান্তিও কাটে চট্‌পট্‌।

গরমকালে যাদের সরাসরি রোদের তাপে কাজ করতে হয়, তাঁদের বলি, দয়া করে রঙ্গিন বিশেষতঃ লাল জামা বা শাড়ি ব্যবহার করবেন না, সেক্ষেত্রে লাল রঙ তাপ-রশ্মি শোষণ করে শরীরকে উত্তপ্ত করবে বেশী। শরীরের তাপ হঠাৎ করে বাড়তে পারে তাঁদেরও, যাঁরা খালি গায়ে কড়া সূর্যের তাপে কাজ করেন। এ অবস্থায় চামড়ার নীচে রক্তবহা নালীগুলো বেশী প্রসারিত হয়ে পড়ে ; এবং

অনেকক্ষণ এভাবে থাকলে শরীরের নীচের অংশে রক্ত জমা হয় বেশি। শরীরে রক্তের এই অসম বন্টনের ফলে হার্টে রক্ত ফেরে কম, প্রতিবার সঙ্কোচনের সময় হার্ট থেকে সারা শরীরে রক্ত ছড়ায়ও কম। এ অবস্থায় মাথা ঝিমঝিম করে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। গরমের দিনে রাস্তায় বাস-স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন, এ-ঘটনা আপনি আমি সবাই বোধহয় দেখেছি। এ ক্ষেত্রে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা, একটু ঠাণ্ডা কিছু খাওয়ান বা একটু পাখার বাতাস চট করে অবস্থা সামাল দিতে সাহায্য করে।

গরমের দিনে জামা-কাপড়ের দিকে একটু নজর দিলেও গরমের কষ্ট অনেকটাই কমে। এমন জামা পরতে হবে যার তাপ শোষণ ক্ষমতা কম এবং যার মধ্যে দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস চলাচল করতে পারে। যদি অসুবিধে না থাকে সাদা রঙের ধুতি-পাঞ্জাবী বা পায়জামা পরুন, শার্ট-প্যান্টের তুলনায় তা বেশী আরামদায়ক। তেমনি মহিলারা যদি শালোয়ার-কামিজের বদলে হালকা রঙের সুতির শাড়ি পরেন সেক্ষেত্রে এই গরমের দিনগুলিতে গরমের কষ্ট খানিকটা কমবে নিশ্চয়।

গরমে কষ্টের আর একটা অন্যতম দিক হল ঘামাচি বা অন্যান্য নানা উপসর্গ। লক্ষ্য করে দেখবেন যাঁদের রঙ ফরসা, সাধারণভাবে তাঁদের ক্ষেত্রে এইসব উপসর্গও বেশী। কারণটা আর কিছুই না, ফরসা ত্বকের তাপ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এমন কিছু মানুষের দেখা মেলে যাঁদের ত্বকে গরম সয় না আদৌ। দুপুর রোদে এঁরা একটু বাইরে বেরলেই সারা গায়ে লাল লাল ছোপ পড়ে, গুটিও বেরিয়ে যায় কারো কারো ক্ষেত্রে। এখানে বিপদের কারণ সূর্যালোকের অতি বেগ্নী এবং অবলোহিত রশ্মি। সংবেদনশীল ত্বকে অতিবেগ্নীরশ্মি কিছু কিছু অবাঞ্ছিত জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার ফলে ত্বকের নীচের স্তর থেকে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে এসে ত্বকে নানা অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে। অবলোহিত তাপ-

রশ্মি ত্বকের গভীরে তাপমাত্রা বাড়ায়, ফলে সেই জায়গায় রক্ত চলাচল বেড়ে জায়গাটা লালচে হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে 'অ্যান্টি-হিস্টামিন'-জাতীয় ওষুধ বা ক্যালামাইন গোত্রের লোশন ব্যবহারে গরমের কষ্ট অনেকটাই কমবে।

গরমের দিনে প্রায় সবাই হয়ত দেখেছেন ঘামের সঙ্গে তেল-জাতীয় পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, যা আবার বাইরের ধুলোবালিকেও টেনে নেয়। ঘামের পর রুমালে মুখ মুছলেই তার প্রমাণ পাবেন হাতে হাতে। এইসব ময়লা জমে ঘাম-গ্রন্থির মুখ বন্ধ হলেই মুশকিল। ঘাম-গ্রন্থির মুখ ফুলে ওঠে, শুরু হয় ঘামাচির যন্ত্রণা। গরমের দিনে যদি নিয়মিত দু-বার ভালভাবে স্নান এবং মাঝে মাঝে ভিজে তোয়ালে দিয়ে শরীর মোছার ব্যবস্থা করেন কেউ—ঘামাচির উপদ্রব কমবে অনেকটাই।

পরিশেষে বলি—গরমে কষ্ট পাওয়া কিন্তু মানুষের একচেটে ব্যাপার নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীরাও গরমে যথেষ্ট কষ্ট পায়—বোধহয় মানুষদের তুলনায় বেশিই। আপনার বাড়ির পোষা কুকুরটার কথাই ধরুন না কেন। পায়ের নীচে ছাড়া এদের ত্বকে ঘাম-গ্রন্থি নেই, অথচ গরমকালে এদের শরীর গরম হচ্ছে আর পাঁচটা প্রাণীর মতনই। তাই গরমের দুপুরে যখন দেখবেন আপনার আদরের কুকুরটি জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে, জানবেন সেটা তার শরীরের বাড়তি তাপকে বার করে দেবার অন্যতম উপায় ছাড়া আর কিছুই না।

যদি কেউ কিছু না মনে করেন, এ প্রসঙ্গের ইতি টানি অন্য এক গরমের কথা দিয়ে। কেউ বা ভোগেন মেজাজের গরমে, কেউ বা টাকার! মনের ডাক্তাররাই বাতলাতে পারবেন কোন দাওয়াইতে তাঁদের এ গরম কমবে!

শীতল পানীয় ঃ একটু শীতল দৃষ্টিতেই দেখা ভাল

গ্রীষ্মের দুপুরে, থার্মোমিটারের পারদ যখন ক্রমেই চড়তে থাকে, প্রচণ্ড গরমে ঘামতে ঘামতে, আমরা অনেকেই নিজেদের অজান্তে, বাড়তি এক খরচায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলি। ভেবে দেখেছেন কখনো ?

সেদিন কথা হচ্ছিল চৌরঙ্গী পাড়ায় এক বন্ধুর অফিসে বসে। ঘরে ঢুকতেই আপ্যায়িত হলাম 'স্ট্যাটাস সিম্বল' কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে। কথা প্রসঙ্গে অবধারিত ভাবে আন্ত্রিক রোগ আর জনডিস্‌ের প্রসঙ্গ এসে পড়ল, তার সূত্র ধরে পানীয় জল।

বন্ধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালেন, গ্রীষ্মকালে পেটের অসুখের ভয়ে তিনি বাইরে জল খান না। বোতলভর্তি ঠাণ্ডা পানীয়ই তাঁর ভরসা। বন্ধুর একটিমাত্র পুত্র, বাবা-মার নয়নের নীলমণি, রাস্তায় বেরলেই তার তেষ্টা পায়, তার তেষ্টা মেটাতে নামীদামী কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস ছাড়া গতি কি ? তাছাড়া বরফ-ঠাণ্ডা শীতল পানীয় যেমনটি তেষ্টা মেটায়, ডাব বা সরবতে তা কি মেটে ?

বন্ধুর তরফ থেকে বাড়িয়ে ধরা পানীয়ের বোতল সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। আমার আবার কোল্ড-ড্রিঙ্কস খাবার মিনিট পনেরোর মধ্যে তেষ্টা পেয়ে যায়, এর পরেই রাস্তায় বেরতে হবে। সুতরাং ....

একটু বরং চায়ের ব্যবস্থা হক, নিদেনপক্ষে এক গেলাস জল। কর্পোরেশনের জলে ক্লোরিন মেশান, আমি মাছি বসা খাবার এড়িয়ে চলি, খাবার আগে হাত ধুই, তাই 'পেটের রোগে ভয় কি আমার ওরে'।

আমার ঐ বন্ধুর মতো হয়ত অনেকেরই দেখা মিলবে, যাঁরা বাইরে পানীয় হিসাবে শুধুমাত্র বোতলে ভরা কোল্ড-ড্রিঙ্কসের ওপর আস্তাশীল। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনাদেরও কি আমার মত কোল্ড-ড্রিঙ্কস খেলেই তেষ্টা বেড়ে যায় ?

হয়ত বা অবাক হবেন, তবু বলি, কোল্ড-ড্রিঙ্কস খাবার পর চট করে তেষ্টা পাওয়া কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ! কেন স্বাভাবিক তা খতিয়ে দেখার আগে বরং আসুন, একটু জেনে নিই তেষ্টা কেন পায়।

তেষ্টা বা গলা শুকিয়ে যাওয়া—মনে রাখতে হবে, এটা সাময়িক-ভাবে সারা শরীরে জলের চাহিদার একটা বহিঃ প্রকাশ মাত্র। আসলে এই চাহিদা আমরা বুঝি আমাদের 'মস্তিষ্ক' দিয়ে বিশেষ কিছু স্নায়ুকেন্দ্র মারফত। মস্তিষ্কের 'হাইপোথ্যালামাস' নামক অংশে বিশেষ কতকগুলো সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ থাকে, যাদের নাম 'অসমোরিসেপ্টর'। কোন কারণে যদি শরীরের কোষের জলের পরিমাণ কমে যায়, পরিভাষায় যাকে বলে 'ডিহাইড্রেশন', সেক্ষেত্রে 'অসমোরিসেপট্র' উত্তেজিত হয়ে তৃষ্ণার অনুভূতি জাগাবে। গ্রীষ্মকালে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ নুন এবং জল বেরিয়ে যায় ঘামের সঙ্গে, ফলে রক্তে জলের ভাগ কমে যায়। এ খবর জানবার জন্যেও বিশেষ কিছু সংবেদনশীল গ্রাহক কোষ আছে হার্টের ভেতরের দেওয়ালে। তারা উত্তেজিত হলেও সে খবর 'ভেগাস নার্ভের মারফত' পৌঁছে যায় হাইপোথ্যালামাসের 'অসমোরিসেপ্টরে।

এবার বরং দেখা যাক এক গেলাস জল বা এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় গলাধঃকরণ করলে সাময়িকভাবে তেষ্টা মেটে কি ভাবে। যে জলটুকু আমরা গলা দিয়ে নামিয়ে দিলাম, তা অন্ত্র মারফত শোষিত হয়ে, রক্তে মিশে শেষমেষ কোষে পৌঁছায় ঠিকই, তবে তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে মুহূর্তে খানিকটা জল গিয়ে পাকস্থলীকে প্রসারিত করল, 'ভেগাস-নার্ভ' দিয়ে খবর পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে—'জলের চাহিদা আপাততঃ মিটেছে'। না, এটা কোন কল্পনা নয়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে—প্রচণ্ড তৃষ্ণায় 'গলা শুকিয়ে কাঠ' অবস্থায় জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে যতই কেউ মুখে রাখুন না কেন, তৃষ্ণা মিটবে না আদপেই। অথচ সেক্ষেত্রে যদি টিউব দিয়ে এক গেলাস জল পাক-স্থলীতে সরাসরি পাঠান যায়, তৃষ্ণা কমবে সঙ্গে সঙ্গে—তবে হ্যাঁ, যদি 'ভেগাস-নার্ভ' অক্ষত থাকে !

এবার আসুন দেখা যাক, প্রচণ্ড গরমে এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় আমরা যখন গলাধঃকরণ করছি সেক্ষেত্রে কি ঘটছে। ঢক ঢক করে জল গিলে পাকস্থলী ভর্তি হলো বটে, কিন্তু পানীয় যদি খুব ঠাণ্ডা হয়, সেই ঠাণ্ডায় ভেগাস-নার্ভ দিয়ে খবর পৌঁছোবে দেরিতে, অর্থাৎ তৃষ্ণা মিটতে সময় লাগবে বেশী। তাছাড়া ঠাণ্ডা পানীয় চট্‌পট নেমে যায় পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে, (অন্ততঃ পরীক্ষাগারে ইঁদুর ও গিনিপিগের ওপর পরীক্ষার ফল তাই বলে!) পাকস্থলী খালি হয়ে আবার তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায়। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে হাত বাড়াতে হবে দ্বিতীয় বোতলটির দিকে!

আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, গ্রীষ্মের দিনে বোতল কয়েক কোল্ড-ড্রিঙ্কস আপনি নিজে খান কি বাচ্চাকে খাওয়ান, কিছু বলার নেই। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনাদের দু-একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই, ভবিষ্যতে হয়ত কাজে লাগলেও লাগতে পারে!

আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী অম্বলের রোগী হন, কোল্ড-ড্রিঙ্কসের বোতলটি হাতে নেবার আগে একটু ভাবুন। বোতলের জলে কিন্তু উচ্চচাপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস 'গোলা' আছে। পাকস্থলীতে পৌঁছোনোর পর এই গ্যাস ফাঁপবে। চাপ পড়বে পাকস্থলীর দেওয়ালে, বাড়বে অ্যাসিড ক্ষরণের মাত্রা। অম্বলের মাত্রা বাড়লে কাউকে দোষ দেবেন না কিন্তু।

কেউ কেউ হয়ত বা ভাবছেন, যাদের অম্বলের দোষ নেই, তাঁদের পক্ষে কোল্ড-ড্রিঙ্কস তো ভালই, বিশেষত বাড়ন্ত শিশুদের পক্ষে তো বটেই, মিষ্টি স্বাদের জন্য তারা এগুলো পছন্দও করে, তাছাড়া টাকা দুয়েকের বিনিময়ে খানিকটা পুষ্টি তো পেটে যাচ্ছে! নাঃ, এবারও হতাশ হতে হবে আপনাদের। মোটামুটি এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ে পুষ্টির মাত্রা কমবেশী পঁচাত্তর ক্যালরি, যা আপনি পাচ্ছেন ঐ বোতলের জলে গোলা চামচ দেড়েক চিনি থেকে। অনেকে আবার বিজ্ঞাপনের পসরা সাজিয়ে ক্রেতাদের জানান, 'আমাদের পানীয়ে ক্যালরির পরিমাণ কম— সুতরাং যাঁরা পুষ্টি সচেতন, তাঁরাও নিশ্চিন্তে

এ পানীয়ে বিশ্বাস রাখতে পারেন'—অর্থাৎ যে সামান্য শক্তি আপনি পেতে পারতেন চিনি থেকে, তাও এঁরা সরিয়ে নিয়েছেন, পরিবর্তে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে 'স্যাকারিন'। এখন 'স্যাকারিন' হচ্ছে এমনই এক বিতর্কিত জিনিষ যেটি শরীরের পক্ষে কতটা কি ক্ষতি করে আমরা তা জানি না। অনেক জীব-রসায়নবিদেরই ধারণা স্যাকারিন সঙ্গে মূত্রাশয়ের ক্যানসারের নাকি একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। এর পরেও কোন ভরসায় স্যাকারিনের ওপর আস্থা রাখবেন—বলুন!

এছাড়াও কোন কোন কোল্ড-ড্রিঙ্কসে 'ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল' ব্যবহার করা হয় যার জন্য পানীয়েয় রঙটা দেখায় অনেকটা অস্বচ্ছ। ইংল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডে এই বিশেষ উপাদানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে যেন বোতলের পানীয়ে মেশান না হয়, কারণ এর ফলে শরীরের মাংসপেশীতে 'ব্রোমিন' জমতে পারে, মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অবশ্য এর ঠিক উল্টোটাই ঘটে 'কোলা' জাতীয় পানীয়গুলোতে। 'ক্যাফিন' থাকার ফলে ক্লান্তি কাটানোর একটা গুন এর মধ্যে আছে। 'ক্যাফিন' যদি বেশী মাত্রায় শরীরে যায় তাহলে তা হার্টকে উত্তেজিত করে, সুতরাং যাঁরা হার্টের রোগী বা উচ্চ-রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের পক্ষে কোলা-জাতীয় পানীয় মানে মানে এড়িয়ে চলাই ভাল। শুধু হার্টের রোগীদেরই নয়, কোলা -পানীয় থেকে দূরে রাখতে হবে বাচ্চাদেরও। এই পানীয়ে ফসফরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশী। যে সব বাচ্চারা কোলা-পানীয়ে আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণ ঠিকমতো হয় না, ক্যালসিয়াম-ফসফরাস অনুপাত ব্যাহত হবার জন্য। তাছাড়া এই কোলা-জাতীয় পানীয় ক্ষিদে নষ্ট করতে ওস্তাদ, ফলে যে সব বাচ্চা হরবখত্ কোল্ড-ড্রিঙ্কস খেয়ে চলেছে, তাদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট বাড়ছে না কি? ঠিক একই কথা বলা যায় সেইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে যাঁরা মা হতে চলেছেন। নিয়মিতভাবে কোলা-পানীয়ে আসক্তা হয়ে পড়লে, অন্ত্রে লোহা শোষণ ব্যাহত হয়, রক্তে কমে

ক্যালসিয়ামের মাত্রা। এতে মা ভুগবেন রক্তাল্পতায়, ক্যালসিয়ামের অভাবে বাচ্চার অস্থি-কাঠামোও ঠিকমতো মজবুত হবে না।

ফসফরিক অ্যাসিডের অপর একটি বদ্‌গুণ, দাঁতের রক্ষাকারী এনামেলের আবরণকে নষ্ট করা। আমরা কোল্ড-ড্রিঙ্কস খাবার পর কখনই জল দিয়ে মুখ ধুই না। ফলে দাঁতের সংস্পর্শে পানীয়ের অংশবিশেষ লেগেই থাকে—বাড়ে দাঁত ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা। কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেছে যাঁদের হাঁপানির প্রবণতা আছে, বিশেষতঃ যে সব বাচ্চাদের, তাদের ক্ষেত্রে কোলা-পানীয় সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। কোলা-পানীয়ের মূল উপাদান 'কোলা'-বাদামের নির্যাস, (যা ব্রাজিল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়) ক্ষেত্র বিশেষে অ্যালার্জিজনিত হাঁপানির কারণ হতে পারে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, এমন কিছু মানুষ আছেন, এমন কি বাচ্চারাও, যাদের কোলা-পানীয় খাবার পরই হাঁচি, গলা ব্যথা শুরু হয়। সেক্ষেত্রে পানীয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই ভাল নয় কি?

অনেক হয়ত ইতিমধ্যে ভাবছেন সবেতেই অসুবিধে হলে চলে কি করে? গ্রীষ্মের দুপুরে তেষ্টা তো এড়ান যাবে না। ঠিক। সে তো ঠিকই। ঐ একই বাজেটে চিন্তা করুন না, আর কি পাওয়া যেতে পারে? লেবুর সরবত, দই, নিদেন পক্ষে লস্যি বা ঘোলের কথা তো ভাবা যেতেই পারে। এতে কিন্তু কিছু বাড়তি সুবিধে আপনি এমনিতেই পাচ্ছেন। দই-জাতীয় পানীয়ে সমমূল্যের অন্য যে কোন পানীয়ের তুলনায় পুষ্টি অনেক বেশী—কারণ এতে থাকছে দুধের সহজপাচ্য প্রোটিন 'কেজিন'। তাছাড়া দইয়ে 'ল্যাকটোব্যাসিলাস' ধরনের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকার দরুন বাইরে থেকে আসা রোগ জীবাণুদের এরা অন্ত্রে বাসা বাঁধতে দেয় না। দই পেটের গ্যাস কমায়, কমায় রক্তের কোলেষ্টেরল! ঘোলের সরবতে এর সঙ্গে পাচ্ছেন বাড়তি খানিকটা চিনি এবং নুন, যা কি না ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া নুন এবং অবসাদকে কাটাতে চট্‌পট কাজ করে।

তবে হ্যাঁ—গরমের দিনে সরবতে বরফ ভাসিয়ে না খাওয়াই ভাল, কারণ দোকানের বরফ, কি পরিবেশে এবং কতটা বিশুদ্ধ জলে তৈরী হচ্ছে তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। আর হাতের কাছে সরবতের খোঁজ না পেলেও রাস্তার মোড়ে কোন না কোন ডাব-বিক্রেতার দেখা আপনি পাবেনই। ক্লান্তি বিনোদনের জন্য বিভিন্ন লবনের সুষম ভাগ এবং জলের মিষ্টতা, এত সুন্দরভাবে প্রকৃতি ডাবের মধ্যে পুরে রেখেছেন যে তার বিকল্প, কোন কৃত্রিম উপায়েই করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলি, এত কথা শোনার পরেও একদল মানুষ নিশ্চয় থাকবেন, যাঁরা তাঁদের পুরোনো অভ্যাসেই চলবেন। তাঁদেরকে আবার সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই—বোতলে ভরা পানীয়ের জন্য যে মূল্য আপনারা দিচ্ছেন, তার সামান্য অংশই যাচ্ছে বিক্রেতার হাতে, লাভের সিংহভাগ পাচ্ছেন সেইসব শিল্পপতিরা, যাঁরা নামমাত্র খরচে এই পানীয়গুলি উৎপাদন করছেন। একটু চিন্তা করুন, তাহলেই বুঝবেন, আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে বিজ্ঞাপন, যা পত্রপত্রিকা, রেডিও-টিভি মারফত আপনার-আমার রুচিকে এমনভাবে তৈরি করছে যে শিল্পপতির উৎপাদনের মুনাফার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও ঝুঁকছি সেদিকেই। অথচ এতদিনে আমরা সব্-বাই জেনে গেছি, বিজ্ঞাপনের গরু গাছেও চড়ে!

সর্দি-কাশি লেবুর জল

হ্যাঁচ্চো !

বাড়ি থেকে সবে পা বাড়িয়েছেন অফিসে যাবেন বলে, এমন সময় ঐ আওয়াজ। হাঁচি-টিকটিকির বাধা যাঁরা মানেন, ত্ব-মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে তাঁদের হবেই, অফিসের খাতায় লাল-কালির দাগ দেখে পাশের বাড়ির ছেলেটার বেআক্কেলেপনার কথা ভেবে বিরক্ত না হয়ে উপায় কী ?

অথচ এর থেকে পরিত্রাণও নেই ! বছরের বিশেষ কটা মাসে, বিশেষতঃ ঠিক শীতকালের মুখে মুখে চারদিকে হাঁচি কাশি সর্দিজ্বরের ছড়াছড়ি। সর্দিকাশি নিয়ে একবার একটা সমীক্ষা হয়েছিল—কে কী হারে ঠাণ্ডা লাগার কবলে পড়েন। দেখা গেছে ঠাণ্ডার ধাত-ওয়ালা মানুষের সংখ্যা শতকরা পঁচিশ, অর্থাৎ এঁরা হামেশাই সর্দিজ্বরে ভুগে থাকেন—বছরে চার পাঁচবার কি তারও বেশী। বেশীর ভাগ মানুষের, অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশভাগ লোকেরই ঠাণ্ডা লাগে বছরে বার-ত্বয়েক। বাকি রইলেন যাঁরা, অর্থাৎ সেই পঁচিশ ভাগ, এঁরা সত্যিই ভাগ্যবান—এঁদের ঠাণ্ডা লাগে বছরে মাত্র একবার, কেউ কেউ আদৌ না ভুগেও পার পেয়ে যান। সব থেকে মজার ব্যাপার—যে দলেরই মানুষ হন না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই ঠাণ্ডা লাগার জোয়ারটা আসে ঠিক শীতের মুখে মুখেই।

প্রশ্ন আসতেই পারে—কেন এমন হয় ? জটিল প্রশ্ন, সন্দেহ নেই। শহর বা শহরতলীতে যাঁরা থাকেন, শীতের সন্ধ্যায় গলিতে বা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে চোখ মুখে জ্বালা-ধরান, বুকচাপা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অভিজ্ঞতা কম বেশী প্রত্যেকেরই আছে। কারণটা আর কিছুই নয়, বায়ু-চলাচল বেগের তারতম্য। গরমকালে যেখানে বাতাসের স্বাভাবিক বেগ ১০ থেকে ১৬ কিলোমিটার, শীতকালে তা ৩

কিলোমিটারেরও কম। সন্ধ্যের পর মাটি আর বাড়ি ঘরদোর সূর্যের থেকে পাওয়া তাপ ছেড়ে ঠাণ্ডা হতে থাকে, এর সঙ্গে ঠাণ্ডা হতে থাকে পৃথিবীর লাগোয়া বাতাসের স্তর। ঠাণ্ডা বাতাস ভারি, ওপরে ওঠা কঠিন, সুতরাং নীচের ঠাণ্ডা বাতাস রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হতে থাকে – আর ওপরের বাতাস থাকে গরম। রাতে বাতাস হয় আরও ঠাণ্ডা, আর সেই সঙ্গে কমে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা —এরই ফল কুয়াশা। না, কথাটা বোধহয় ভুল হল – কুয়াশা নয় ধোঁয়াশা। ধুলো, কার্বন-মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোকার্বনের নানা যৌগ,নানা বায়ুদূষক আর কুয়াশা – মিলে মিশে এক কিম্ভুত-কিমাকার অবস্থা। বাড়ির উনুন, যানবাহন থেকে বেরিয়ে আসা পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়া আর কলকারখানার চিমনিগুলোর এ ব্যাপারে অবদানের কথা বোধহয় নতুন করে বলে দিতে হবে না।

দেখা গেছে ধোঁয়াশা কিংবা বাতাসে দূষকের পরিমাণ বাড়লে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সর্দিজ্বর, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস আর নানা শ্বাসঘটিত রোগের প্রকোপ। এই দুই-এর সম্পর্কটা যথেষ্ট জটিল, তবে এক কথায় বললে বলতে হয় বায়ুদূষকরা বাতাসের সঙ্গে নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালী বা ফুসফুসের দেওয়ালের কোষগুলোকে বিরক্ত করতে শুরু করে। আর বিরক্ত করলে প্রতিবাদ আসবেই—শ্বাসনালীর কোষ এবং রক্তের শ্বেতকণিকারা প্রতিবাদ হিসেবে নানা রাসায়নিক যৌগ ঐ জায়গায় ছড়াতে থাকে। এইসব রাসায়নিক, পরিভাষায় যাদের নাম 'বায়োলজিক্যাল অ্যামাইনস্', স্থানীয়ভাবে তারা কিছু প্রতিক্রিয়া শুরু করে, যেমন ঐ জায়গায় রক্ত চলাচলের হার বেড়ে যায়, শ্বাসনালীর ভেতরের দেওয়ালের গা থেকে শ্লেষ্মা বেরতে থাকে, উদ্দেশ্য —আপদ সৃষ্টিকারী বস্তুটিকে শরীরের বাইরে পাঠান। এখন যে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করছে তার সঙ্গে থাকছে অসংখ্য রোগ-জীবাণু। সর্দিজ্বরের ভাইরাসও এই সুযোগে থাকে। তাছাড়া, বেশী ঠাণ্ডায় শ্বাসনালীর ভেতরের দেওয়াল থেকে আপনিই

শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসে। নাক দিয়ে ঝরে কাঁচা জল। এই ধরনের পরিস্থিতি কিন্তু ভাইরাসদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

এছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। আগেই বলেছি শীতকালে বায়ু-চলাচলের বেগ কম, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাও কম। মানুষজন ট্রামেবাসে ঠাসাঠাসি করে যাতায়াত করেন, এদিকে বাড়ে মেলা, সভাসমিতি, গানবাজনার আসরের সংখ্যা। সোজা কথায়—এই সময় অল্প জায়গায় লোকের ভীড় বাড়ে বেশী। এরই মধ্যে যাঁরা সর্দি কাশিতে ভুগছেন তাঁরা খুক খুক কেশে চলেছেন। প্রতিবার কাশির সঙ্গে স্প্রে-র মতো বেরিয়ে আসছে অদৃশ্য অসংখ্য জলকণা, সঙ্গে সর্দিকাশির ভাইরাস। মুহূর্তের মধ্যে জলকণা বাতাসে মিলিয়ে গেল, ভাইরাসরা ভাসতে লাগল বাতাসে। পরিসর অল্প, একই বাতাসে বহু লোক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালাছেন, সুতরাং—! রাতে কোথায় কোন বক্তৃতা না 'ফাংশান' শুনতে গিয়েছিলেন, রাত পোহাতেই গলার মধ্যে কেমন যেন খুস খুসে ভাব, থেকে থেকেই 'হ্যাঁচ্চো'!

সর্দিজ্বরের প্রাথমিক লক্ষণের কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য আছে। কেউ বা রুমালে অবিরাম চোখ-নাক মুছে চলেছেন, কার বা চোখ ছলছল সঙ্গে টিপটিপে মাথা ব্যথা, আবার অনেকের মুখে বা নাকে স্বাদ-গন্ধের ব্যাপারটাই চলে যায়, কোথাও বা রাত্রে মাথা বালিশে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশির ধমক। আর এর সঙ্গে যদি গাঁটে ব্যথা আর জ্বরের উপসর্গ জোটে, তাহলে প্রায় চোখ বুঁজে গলায় 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' -মার্কা লেবেল ঝোলানো যেতে পারে।

সর্দিজ্বরের ভাইরাসদের বসবাস মোটামুটি নাক, নাকের সাইনাস বা গলা—এই গণ্ডীর মধ্যে। এরা চট্ করে এই সীমা ছাড়ায় না। প্রশ্ন উঠতেই পারে—সর্দিজ্বর হলে অবধারিতভাবে অন্তত শতকরা পঁচানব্বই জনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বুকে পিঠে সর্দি বসেছে। সেটা তাহলে হল কীভাবে? এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, সর্দিজ্বরের ভাইরাস এর জন্য দায়ী নয়। ভাইরাস আক্রমণের ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ কমজোরী হয়ে

পড়ে, সেই ফাঁকে হামলা চালায় ব্যাকটেরিয়া, বিশেষতঃ 'নিউমোকক্কাস' গোষ্ঠীভুক্ত যারা। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম—ভাইরাস জমির দখল নিয়েছিল, ব্যাকটেরিয়া এসে বাড়ি তুলল। এই 'নিউমোকক্কাস' ব্যাকটেরিয়ারা কিন্তু প্রায় সবসময়ই আমাদের নাক বা গলায় থাকে, সুস্থ শরীরে তারা বিশেষ কোন বিপত্তি ঘটাতে পারে না। যখনই সর্দির আক্রমণে চোখ নাক দিয়ে জল ঝরতে থাকে, সেই জলের সঙ্গে মিশে এই ব্যাকটেরিয়ারা পৌঁছে যায় শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে, যেখানে সুযোগ পেলেই ব্যস্—এরা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার শুরু করে। তারা সদলবলে শ্বাসনালীতে হামলা চালায়—পরিভাষায় যার নাম 'ব্রঙ্কাইটিস'। যখন এই আক্রমণের কেন্দ্র হয় ফুসফুস, রোগটা নিউমোনিয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সুতরাং সর্দি-জ্বরের লক্ষণ দেখা মাত্র ডাক্তাররা যে অ্যান্টিবায়োটিক বা ঐ ধরনের ওষুধ খেতে বলেন—তার কারণ একটাই, ব্যাকটেরিয়া যাতে আক্রমণ না করতে পারে। অবশ্য এর সঙ্গেও থাকে নানা ওযুধ, কাফ-সিরাপ বা ঐ ধরনের কোন ট্যাবলেট যাদের কাজ সর্দির যে সব প্রাথমিক লক্ষণ—গলা খুসখুস বা নাক দিয়ে জলপড়া, এগুলোকে আটকান। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ভাইরাসের আক্রমণ আটকানোর সার্থক কোন ওযুধ এখনো বাজারে আসেনি, অধিকাংশ কাফ-সিরাপ বা ট্যাবলেট খেয়ে আমরা যে সাময়িক উপশম পাই, তার অনেকটাই কিন্তু মানসিক! আর এই মানসিক দুর্বলতাকে ভাঙ্গিয়ে বাজার মাত করে বহুজাতিক দাওয়াই ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া ঐসব ট্যাবলেটের অনেকগুলোতেই এমন কিছু অনুপান ও রাসায়নিক মিশ্রণ থাকে যার থেকে ক্ষেত্রবিশেষে নানা বিরূপ 'সাইড এফেক্ট' দেখা দেওয়াও বিচিত্র নয়।

সর্দির ওষধের মধ্যে অনেকগুলোই আছে 'অ্যান্টি-হিষ্টামিন' গোত্রের, যাদের কাজ নাক বা গলার ভেতরের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা 'হিষ্টামিন' বা অন্যান্য 'বায়োলজিক্যাল অ্যামিন'দের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। এখানেও মনে রাখতে হবে, এ-ধরনের ওষুধ ব্যবহার

করে ফল পাওয়া যেতে পারে একেবারে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ যখন নাক দিয়ে সবে কাঁচা জল গড়াচ্ছে। পরবর্তী ধাপে এগুলো ব্যবহার করলে উপকার তো কিছু হবেই না উল্টে বিপত্তি ঘটাও বিচিত্র নয়। 'অ্যান্টি-হিষ্টামিন' জাতীয় ওষুধগুলো শ্বাসনালীর ভেতরের দেওয়াল থেকে শ্লেষ্মার নিঃসারণ কমিয়ে দেয়, ফলে অনেকসময় তা অস্বস্তির কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

গত কয়েকবছরের গবেষণায় দেখা গেছে কোন জায়গায় কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সেখানে থেকে 'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন' ধরনের বিশেষ কিছু রাসায়নিক প্রাথমিকভাবে বেরিয়ে আসে। এই প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন-ই আবার নিজেরা সরাসরি বা 'বায়োলজিক্যাল অ্যামাইনসের' মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেকে হয়ত দেখেছেন প্রাথমিক অবস্থাটা সামাল দিতে 'অ্যাসপিরিন' গোত্রের ওষুধগুলোর জুড়ি নেই। এই অ্যাসপিরিন আক্রান্ত জায়গায় প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন তৈরির হার অনেক কমিয়ে দেয়। কিন্তু এত সব বিপত্তির মূলে যে সর্দিকাশির ভাইরাস, তাদের বিরুদ্ধে কোন ওযুধই প্রায় কাজ করে না। তারা শরীরে আসবে বা যাবে নিজেদের খেয়ালখুশিতে, ওষুধ-বিসুধের বিশেষ কোন ধার তারা ধারে না! অর্থাৎ ওষুধ খেলে সর্দি সারবে সাত দিনে, না খেলেও লাগবে এক সপ্তাহ! অবশ্য ব্যাকটেরিয়াদের পরবর্তী কীর্তিকলাপ এই হিসেবের মধ্যে ধরলে চলবে না। প্রসঙ্গত বলি, কয়েক বছর আগে থেকেই রুশ দেশে সর্দিজ্বরের প্রতিষেধক 'ইন্টারফেরন' নাকে দেবার ড্রপ হিসেবে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই 'ইন্টারফেরন' বস্তুটি আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থারই অংশবিশেষ—রোগ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে রক্তের শ্বেতকণিকারা এই 'ইন্টারফেরন' তৈরী করে। অবশ্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে 'ইন্টারফেরন' তৈরী হচ্ছে তার মূলে আছে 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-র ক্রিয়া-কৌশল!

এবার বরং প্রতিরোধের দিকটায় আসা যাক। প্রথম কথা, চট্ করে ঠাণ্ডা লাগাবেন না। শীতকালে সকাল বা সন্ধ্যেবেলা ঘরের

গরম থেকে বাইরে যাবার আগে কান গলা মাথা ঢেকে নিন, আগেই বলেছি সর্দিজ্বরের ভাইরাসদের ওগুলো বড় প্রিয় জায়গা। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া ভাল, বিশেষত লেবুর জল। বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা—'ভিটামিন-সি' 'ঠাণ্ডা'-লাগা আটকায়। খুব বেশী পরিমাণে দরকার নেই—দিনে এক-দেড়শো মিলিগ্রামই যথেষ্ট। সারাদিনে একটা লেবু বা টমেটো থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে। অনেকে বেশী উৎসাহ করে ৫০০মিলিগ্রাম 'ভিটামিন-সি' ট্যাবলেট দিনে তিন চারটে করে খেয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, নাক দিয়ে জলপড়া বা খুকখুকে কাশি আটকাতে তা অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া, যাঁদের পরিবারে মূত্রাশয়ে পাথুরীর ঘটনা একাধিক ক্ষেত্রে জানা আছে, তাঁরা বেশী 'ভিটামিন-সি' খাবার আগে একটু ভেবে দেখবেন। এছাড়া অনেকের আবার 'ভিটামিন-সি'তে অ্যালার্জি আছে, সেক্ষেত্রেও সাবধান। যে ক্ষেত্রে অবিরাম নাক দিয়ে জল পড়ছে, সে অবস্থায় চারঘণ্টা অন্তর অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে এক বা দুদিন। অবশ্য যাঁদের অত্যধিক অম্বলের ধাত কিংবা পেটে আলসারের খবর জানা আছে, তাঁদের পক্ষে অ্যাসপিরিন পেটে না যাওয়াই মঙ্গল। কাশি কমানোর জন্য রাত্রে মাথায় দুটো বালিশ দিন, শুতে যাবার আগে মাথা ঢেকে গরমজলের ভাপ। গরম বাষ্প নাকে গিয়ে শ্বাসনালীর ভেতরের দেওয়ালে জমে থাকা শ্লেষ্মাকে নরম করে দেয়, কমায় অস্বস্তির ভাব। শোবার সময় মুখে লবঙ্গ রাখা যেতে পারে। অ্যান্টি-হিষ্টামিনযুক্ত কাফ-সিরাপ চট করে না খেয়ে আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই ভাল, এতে অনেক সময় অহেতুক বিপত্তি এড়ান সম্ভব।

বকনা গরুর দুধ !

খবরটা অনেকেরই চোখে পড়েছিল নিশ্চয়। গত ১৯৮৫-র মার্চমাসে খবরের কাগজে এধরনের একটা সংবাদ ছিল—কাঁচরাপাড়ার মিলননগরে একটি গরু গাভীন ছাড়াই দুধ দিচ্ছে। পরিচিত দু-এক জন যাঁরা কাছাকাছি থাকেন, তাঁদের মুখেও একই কথা শুনেছিলাম। অসংখ্য মানুষ কাঁচরাপাড়া যাচ্ছেন, ট্রেন-বাসে অস্বাভাবিক ভিড়, প্রত্যেকেই চান প্রসাদ হিসেবে ঐ দুধ নিতে। তাতে নাকি রোগমুক্তি হবার সম্ভাবনা প্রবল। যাঁদের মুখে খবরটা শুনেছিলাম, তাঁদের কয়েকজন বলেছিলেন—প্রকৃতিতে কত কিছুই ত ঘটে। সবই কি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে ?

প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভাল—এ ঘটনা কিন্তু নতুন নয়, অতীতেও একই সংবাদ পাওয়া গেছে বিভিন্ন সূত্রে। তবে হ্যাঁ, এ ধরনের ঘটনা ঘটে কচিৎ কদাচিৎ! ১৯৮২-র মে-মাসে বারাসত ১নং ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রামে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে একমাস বয়সের এক বাছুর দুধ দিচ্ছে। কলকাতাব 'উৎস-মানুষ' (জুন ১৯৮২) গোষ্ঠীর তরফে এক অনুসন্ধান চালান হয় এ ব্যাপারে। দুধের নমুনা নিয়েও পরীক্ষা করান হয় কলকাতার সেণ্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরিতে। পরীক্ষাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে বাছুরের বাঁট থেকে যা পাওয়া গেছে তা দুধ ছাড়া কিছুই নয়!

প্রশ্ন আসতেই পারে—কিভাবে এই দুধ তৈরী হচ্ছে ? উত্তর পেতে গেলে প্রথমে একটু জানা দরকার—প্রাণীদের শরীরে দুধ তৈরী হয় কি ভাবে।

যে কোন স্তন্যপায়ী স্ত্রী-প্রাণীর ক্ষেত্রে, স্তনগ্রন্থির বিকাশ শুরু হয় কৈশোরের প্রারম্ভে। এর জন্য দায়ী মূলতঃ ডিম্বাশয় গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা দুটি হরমোনের ক্রিয়াকলাপ, যাদের নাম ইস্ট্রোজেন ও

প্রজেষ্টেরন। অবশ্য প্রজাতি ভেদে এই দুটির ভেতর যে কোন একটি বেশী সক্রিয় হতে পারে, যেমন গরুর ক্ষেত্রে ইষ্ট্রোজেন হরমোনের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। স্তনগ্রন্থির গঠন অনেকটা 'আঙ্গুরের থোকার' মত ; প্রতি আঙ্গুরের মত 'অ্যালভিওলাসে' তৈরী হয় দুধ, যা ফোঁটা ফোঁটা করে এসে জমা হয় বাঁটের গোড়ার 'মিল্ক-সাইনাসে'। তবে হ্যাঁ, শরীরে দুধ তৈরি হয় তখনই, যখন গর্ভ-সঞ্চার হয়। অবশ্য গর্ভাবস্থায় সাধারণত দুধ আসে না, কারণ রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি টেনে নিয়ে দুধ তৈরির ব্যাপারটা আবার তৃতীয় একটি হরমোন 'প্রোল্যাকটিনের' ওপর নির্ভরশীল। এই 'প্রোল্যাকটিন' তৈরি হয় মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির সামনের ভাগে। বাছুরের জন্মের পর যখনই সে মা'র বাঁটে মুখ দিয়ে টানতে থাকে, বাঁট থেকে স্নায়ু মারফত সঙ্কেত চলে যায় মস্তিষ্কের 'হাইপো-থ্যালামাস' অংশে। 'হাইপোথ্যালামাস' এক্ষেত্রে কাজ করে দুটি—প্রথমতঃ তার নিজস্ব হরমোন পি. আই. এফ. বা প্রোল্যাকটিন ইনহিবিটিং ফ্যাক্টারের নিঃসরণ কমিয়ে দেয়, ফলে পিটুইটারি থেকে প্রচুর পরিমাণে 'প্রোল্যাকটিন' বেরিয়ে (সেই সঙ্গে অল্পমাত্রায় STH, TSH, ACTH প্রভৃতি হরমোন) স্তনগ্রন্থিতে দুধ তৈরির কাজ আরম্ভ করে দেয় পুরোদমে। হাইপোথ্যালামাসের দ্বিতীয় কাজটি হল স্নায়ু মারফত পিটুইটারি গ্রন্থির পেছনের অংশে খবর পাঠিয়ে 'অক্সিটেসিন' নামের চতুর্থ একটি হরমোনের নিঃসরণ বাড়ান, যার কাজ স্তনগ্রন্থির অ্যালভিওলাসের লাগোয়া পেশীগুলির সংকোচন ঘটিয়ে অ্যালভিওলাসে জমা দুধ বার করে দেওয়া।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি গরু যখন গাভীন হয়, তার দুধের পরিমাণ কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যায়, আবার বাছুর জন্মানর পরেই দুধ আসে প্রচুর পরিমাণে। এখানে রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে 'গর্ভফুল' বা 'প্লাসেন্টার' মধ্যেই। গর্ভাবস্থায় 'প্লাসেন্টা' থেকে তৈরি হয় প্রচুর পরিমাণে প্রোজেষ্টেরন ও কিছু পরিমাণে ইষ্ট্রোজেন হরমোন। ইষ্ট্রোজেন যদিও পিটুইটারি থেকে

প্রোল্যাকটিন ক্ষরণ বাড়ায়, তবু রক্তে প্রোজেষ্টেরনের পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায় ইষ্ট্রোজেন থাকে নিষ্ক্রিয়। বাছুর জন্মানর ঠিক আগে রক্তে প্রোজেষ্টেরনের মাত্রা কমতে থাকে, ফলে পিটুইটারি সক্রিয় হয়ে দুধ নিঃসরণ ব্যবস্থা চালু হয়।

এবার বরং ভাবা যাক, গরু গাভীন না হয়েও তার বাঁটে দুধ আসা সম্ভব কি না। নিশ্চয় সম্ভব, কারণ যে কোন ভাবে যদি রক্তে 'প্রোল্যাকটিন' হরমোনের মাত্রা বাড়ে, এবং সেই প্রাণীর শরীরে ইষ্ট্রোজেন-প্রোজেষ্টেরন হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বিকাশ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাঁটে দুধ আসবেই। কাঁচরাপাড়ার 'অলৌকিক' ঘটনাটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল কারণ গরুটির বয়স প্রায় সাত বছর অর্থাৎ ইষ্ট্রোজেন-প্রোজেষ্টেরনের প্রভাবে তার স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটার যথেষ্ট সময় সে পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে, যে গরুটি এযাবৎ একটিও বাছুর দেয়নি, তার শরীরে প্রোল্যাকটিন হরমোন হঠাৎ সক্রিয় হল কেন?

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দুভাবে এটি ঘটা সম্ভব—এক, বিশেষ কিছু ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ গরুটির শরীরে ঢুকে 'প্রোল্যাকটিন' বাড়িয়ে দিয়েছে কিংবা বিশেষ কোন অসুখের ফলে এ অবস্থার হঠাৎ সৃষ্টি।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে রেসারপিন, আলফামিথাইল ডোপা কিংবা ফিনোথায়াজিন-গোত্রের রাসায়নিক বেশি মাত্রায় শরীরে এলে হঠাৎ করে দুগ্ধ-ক্ষরণ বা 'গ্যালাকটোরিয়া' হতে পারে। ওষুধ হিসেবে এদের প্রত্যেকটিরই সুনির্দিষ্ট ব্যবহার আছে। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা হিসেবে স্টেরয়েড, বিশেষতঃ ইষ্ট্রোজেন জাতীয় স্টেরয়েডের ব্যবহার সুপ্রচলিত। এটি প্রমাণিত সত্য যে এইধরনের ওষুধগুলি 'হাইপোথ্যালামাস' থেকে 'প্রোল্যোকটিন-ইনহিবিটিং-ফ্যাক্টর' নিঃসরণে বাধা দেয়, ফলে পিটুইটারি থেকে প্রোল্যাকটিন ক্ষরণ বাড়ে। মহিলাদের মধ্যেও দেখা গেছে কোন কোন গর্ভনিরোধক বড়ি ক্ষেত্রবিশেষে এই 'গ্যালাকটোরিয়া' উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে।

বলা বাহুল্য, এগুলিও স্টেরয়েড-জাতীয় ওষুধ।

অসুখের প্রসঙ্গে যে রোগটার নাম প্রথমেই মনে আসে, তা হল 'ফরবেস অ্যালব্রাইট সিনড্রোম'। এক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার ব্যতিরেকেই দুধ আসতে থাকে, একটানা, অনেকদিন ধরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এর জন্য দায়ী পিটুইটারি গ্রন্থির বিশেষ একধরনের টিউমার বা 'ক্রোমোফোব অ্যাডিনোমা'। পিটুইটারির যেসব কোষ থেকে প্রোল্যাকটিন হরমোন তৈরি হয়, তাদের টিউমারের ফলে এই বিপত্তি। করোটির যে বিশেষ অংশ 'সেলা-টারসিকা' তার এক্স-রে পরীক্ষাতে সহজে ধরা যেতে পারে এ ধরনের টিউমার থাকার সম্ভাবনা আছে কি না।

হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি, এই দুই-এর মধ্যে অন্যতম যোগসূত্র হল একটি বিশেষ পোর্টাল শিরা। যদিও বিরল, তবু দেখা যায় এই শিরার মধ্যে ছোট্ট রক্তের ডেলা জমে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এতে পিটুইটারিতে 'প্রোল্যাকটিন ইনহিবিটিং-ফ্যাক্টর' পৌঁছায় কম, ফলে প্রোল্যাকটিনের মাত্রা বেড়ে বাঁটে দুধ আসা অসম্ভব নয়।

বন্ধ্যাত্বের জন্য পিটুইটারি গ্রন্থির 'গোনাডোট্রপিন' বা যৌন গ্রন্থি-উত্তেজক হরমোনের অভাব যখন দায়ী, সে সব ক্ষেত্রে প্রায়শঃ দেখা যায় রক্তে প্রোল্যাকটিনের মাত্রা যথেষ্ট বেশি। এসব ক্ষেত্রেও 'গ্যালাকটোরিয়া' বা দুধ আসা বিচিত্র নয়। এমনও রিপোর্ট আছে যেখানে 'থায়রয়েড' গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তার সূত্র ধরেও দুগ্ধক্ষরণ শুরু হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে গ্যালাকটোরিয়ার জন্য ভাইরাস আক্রমণও দায়ী হতে পারে—বিশেষতঃ 'হারপিস্ জোস্টার' ভাইরাস। বুকে সংক্রমণ হলে এরা নার্ভের গোড়া ক্ষতিগ্রস্থ করে। যদি স্তনগ্রন্থির নার্ভে এধরনের প্রদাহ হয়, সেক্ষেত্রে 'রিফ্লেক্স' বা প্রতিবর্ত-ক্রিয়া মারফত দুধ আসতে থাকবে, যেমনটি হয় বাছুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে টানলে।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কাঁচরাপাড়া মিলননগরের ঘটনার

পেছনে কোন 'অলৌকিকত্ব' নেই। দরকার ছিল গরুটিকে নিয়ে বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিন্তু জনগণের উন্মাদনার বিরুদ্ধে এধরনের পরীক্ষার কথা চিন্তাও অসম্ভব। স্থানীয় কিছু মানুষ এ ব্যাপারে কিছু পরীক্ষার কথা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনগণের ধর্মীয় উন্মাদনার ভয়ে তাঁরা আর এগোতে সাহস পাননি।

যে ঘটনা সচরাচর ঘটে না, তা দেখে অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভ্রান্তিকে মূলধন করে কতিপয় মানুষ ব্যবসা চালু করবে, এটা কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

ঝড়ে মরে কাক

পাঁচসিকে পয়সা, গোটা সুপুরি পাঁচটা, পাঁচটা পানপাতা আর এককিলো চাল। ব্যাস্—আর কিছু লাগবে না। প্রতি শনিবার আমাদের ওখানে পূজো হয়, মন্ত্রপড়া ধাতুর টুকরো এনে দেবো, রূপোর সঙ্গে মিশিয়ে আড়াই-প্যাঁচি আংটি করে ধারণ করো—এক সপ্তাহের মধ্যে হাতে হাতে ফল। জানাশোনা কতো কঠিন রোগীকে ভাল করতে দেখেছি····

পাঠক মাত্রেরই বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে রোগটার নাম অর্শ। রাস্তায় ঘাটে একটু নজর করে চলুন, বহু মানুষের হাতের অনামিকাতে দেখবেন আড়াই-প্যাঁচি রূপোর আংটি। জিজ্ঞাসা না করেও বলা যায় যে অর্শ মানুষটির নিত্যসঙ্গী, জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াতে তিনি এই দাওয়াই-এর শরণাপন্ন হয়েছেন। মনে সাহস নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন—দাদা, আংটি ধারণ করে উপকার পেলেন? শতকরা নব্বইজন উত্তর দেবেন—নিশ্চয়, ধারণ করার পর থেকে বলতে নেই, মোটামুটি একরকম আছি। বহু ডাক্তার দেখিয়েছি, বিশেষ লাভ হয় নি। শেষে এক বন্ধু এই আংটির সন্ধান দেন। আপনার দরকার নাকি?

এই ধরনের ঘটনা অবিশ্বাসী মনে প্রায়ই প্রশ্ন তোলে—সত্যিই কি তাহলে আংটির বিশেষ কোন গুণ আছে? বিশ্বাসটা আরো জোরদার হয় যখন দেখা যায় মাত্র পাঁচসিকের বিনিময়ে একটা ধাতুর টুকরো পাওয়া যাচ্ছে, যা কি না আংটি হিসেবে ধারণ করে কিছু না কিছু সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলবেন —মশাই, সব কিছু কি বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে? দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা আছে তো? এটা সেই রকমই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়?

যুক্তিবাদী মনে এবার প্রশ্ন ওঠে—সবটাই কি তাহলে

কাকতালীয়? দশজনের মধ্যে নজন যদি সুফল পায়, সেক্ষেত্রে 'প্রব্যাবিলিটি' বা 'সম্ভাব্যতার সূত্র' দিয়ে আদৌ ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। হতে পারে এমন অনেক কিছুই আছে, বিজ্ঞান যার উত্তর খুঁজে পায়নি আজও। অর্শের আংটির নিয়ম হচ্ছে একজন রোগীর ব্যবহার করা আংটির থেকে ছোট্ট একটা টুকরো কেটে নিয়ে অপরকে ধারণ করানো—হয়তো বা 'বিশেষ কিছু' রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা ঐ আংটিতে সঞ্চারিত হয়, যার প্রভাবটা পড়ে ধারণকারীর ওপর। এ ছাড়া কি-ই বা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

সত্যিই কি তাহলে এই রহস্যের কোন সমাধান নেই? প্রশ্নটা রেখেছিলাম কলকাতা শহরের একাধিক বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকের কাছে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা মনে হয়েছে তা হলো—

(১) অর্শ এমনই একটা রোগ, যা পর্য্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে।

(২) অনেক সময় দেখা যায় অর্শের প্রকোপ যখন কম, এই অবস্থা টানা পাঁচ সাত বছরও চলতে পারে।

(৩) খাবার দাবারে ঝাল মশলা কম থাকলে অর্শরোগীদের কষ্টও থাকে কম।

(৪) খাবার ব্যাপারে সংযম, নিয়মিত রাত্রে স্নান বা গা ধোয়া, শক্ত কাঠের চেয়ারে বসার অভ্যাস এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূরে রাখতে পারলে অর্শের প্রকোপ কমবেই।

এবার চিন্তা করুন, কমার মুখে আংটি ধারণ করলে দ্রব্যগুণের জয়জয়াকার। তাহলে কি আংটির কোন গুণই নেই?—একেবারে অস্বীকার করাটাও বোধহয় ঠিক নয়। এতে অন্ততঃ মনের জোরটা তো বাড়ে? কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর। রোগভোগের ব্যাপারে একথা বেশ ভালভাবে খাটে। হালআমলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মনের জোরে ক্যানসারের মতো অসুখও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব! সুতরাং আংটি ধারণ করে কেউ যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে এবার তাঁর অর্শ কমবে, এবং তিনি খাবার

ব্যাপারে সংযমী হন (বাস্তবে অবশ্য হতে বাধ্য হবেন—অর্শের কষ্ট থেকে দূরে থাকার জন্যে যদি কাউকে বলা হয় কিছু খাবেন না, তাও তিনি মানবেন বোধহয়!) সেক্ষেত্রে ফলও পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি। মনে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে একটা কড়ি কি তামার পয়সা, মায় একটা নুড়ি-পাথর ধারণ করলেও সুফল মিলবে। 'অন্যলোকে যা করছে' তাই দেখে বিশ্বাস বাড়ার প্রশ্ন আছে—সুতরাং আড়াই-প্যাঁচি রূপোর আংটির সঙ্গে বিশ্বাসের ব্যাপারটাও একটু ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত! একটু বিশদভাবে খোঁজখবর নিলেই জানা যায় যে আংটি ধারণ করা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিটি রোগীরই অর্শ মাঝে মাঝে বাড়ে তার নিজস্ব নিয়মেই।

অনেকে হয়ত বলবেন—সামান্য একটা রূপোর আংটি ধারণ করে যদি বিশ্বাস বাড়ে এবং সেই সঙ্গে কষ্ট কমে—তাহলে ক্ষতি কি? অবশ্যই কোন ক্ষতি নেই—আপত্তি শুধু লোক ঠকানো ব্যবসায়। শুনলে হয়তো আশ্চর্য্য লাগবে—প্রতি চারজনে একজন মানুষ অর্শে ভোগেন। রোগী সংখ্যাকে পাঁচসিকে দিয়ে গুণ করলে যে অঙ্কটা দাঁড়াবে তা কিন্তু নেহাত কম নয়! এবং এই টাকা পকেটে ঢুকছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের যাদের পেশাই হচ্ছে লোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে টাকা রোজকার করা। রোগ কমে নিজের নিয়মে—নামডাক হয় তাবিজ-কবচ-গুণিনের। একেই বোধহয় বলে—'ঝড়ে মরে কাক, ফকীরের বাড়ে জাঁক'!

আপনি কি 'স্বজন বিবাহ' সমর্থন করেন ?

বিয়ের বাজারে পছন্দসই পাত্র-পাত্রী মেলা একটা বিরাট সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা প্রায়-সব বর্ণ-হিন্দু পরিবারে শোনা যাবে —সগোত্রে আপত্তি আছে। আর সপিণ্ড ? নৈব নৈব চ! অথচ যুগের হাওয়া পাল্টাছে, যাঁদের চিন্তাধারা আধুনিক, তাঁরা জাত-গোত্র মানেন না। আত্মীয়দের মধ্যে কুটুম্বিতার সম্পর্ক বিরল নয় আর। আর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরতলার বাসিন্দা যাঁরা, সেখানে 'সপিণ্ডের' প্রবণতাই যেন বেশি। মামাতো-পিসতুতো বা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো, এইধরনের সম্বন্ধের পক্ষে সম্ভবত বড় যুক্তি— পরস্পর পরস্পরকে আগে থেকে চিনলে মানসিক বোঝা-পড়াটা হয় বেশি। অবশ্য তার চাইতেও বড় কোন কারণ অন্য কোথাও থাকতে পারে। জীবিকায় ব্যবসায়িক গোপনতা (Trade Secret) রক্ষা করা তেমনি একটা কারণ। উদাহরণ হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশে উপকূলব্যাপী নুলিয়া, অন্ধ্রের 'আচারুলু' বা সূত্রধর সম্প্রদায়, তিরু-পতির পাটুশালি অর্থাৎ যারা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত তন্তুবায় সম্প্রদায় —এদের নাম করা যেতে পারে। দক্ষিণভারতে সপিণ্ড বিবাহের অত্যধিক প্রচলনের এটিই অন্যতম কারণ কি না, তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ইতিহাস ঘাঁটলে মোটামুটিভাবে দেখা যায় আর্য-সভ্যতার আগে ভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তবে অনার্যদের উপর আর্যদের কর্তৃত্ব চালানর উদ্দেশ্য নিয়েই যে বর্ণভেদ প্রথা চালু হয়েছিল, এ নিয়ে কিন্তু দ্বিমত নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র—এই বর্ণ বিভাগের ভিত্তি মূলতঃ পেশা বা বৃত্তি। আর্যরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা বুঝেছিল এই বিভেদ টিকিয়ে রাখা মুস্কিল যদি না এদের মাঝে বিয়ের ব্যাপারে প্রাচীর থাকে। বলা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে

সফল হয়েছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে একই বর্ণের মধ্যে দেওয়াল তুলে সৃষ্টি করা হয়েছিল নানা জাতি, উপজাতি, শ্রেণী, গোত্র, কূল ইত্যাদি। সেযুগেও বিবাহের ব্যাপারে কিছু কিছু বিধিনিষেধ ছিল – সগোত্র অর্থাৎ একই গোত্র বা কুল উদ্ভূত ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না ; পিতৃকুলে সাতপুরুষ ও মাতৃকুলে পাঁচ পুরুষে অন্তর্বিবাহ বা 'সপিণ্ড' নাস্তি। অর্থাৎ বাবার বা মা'র তরফে পাত্র-পাত্রী দুজনেরই যদি সাত বা পাঁচ পুরুষ আগে অন্তত একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ (common male ancestor) থাকে, সেক্ষেত্রে বিবাহ অনুমোদনযোগ্য নয়।

বিবাহের ব্যাপারে এই বাধানিষেধ আজকের দিনেও মানা হচ্ছে। উত্তর ভারতে বেশি, দক্ষিণ-ভারতে কম। তবে এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রে অন্তর্বিবাহের হার যথেষ্ট বেশি। এইসব রাজ্যেও আবার সর্বত্র আত্মীয় বিবাহের হার সমান নয়। সমুদ্রের উপকূল থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, অন্তর্বিবাহের হারও কমে আসবে তত।

সারা ভারতবর্ষের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যায় বর্তমানে প্রচলিত অন্তর্বিবাহ মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে – 'প্যারালাল কাজিন' বা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো-ভাইবোনে বিয়ে, 'ক্রস কাজিন' বা মামাতো-পিসতুতো সম্পর্ক এবং 'আঙ্কল-নিস' বা মামা-ভাগ্নীর বিয়ের সম্পর্ক। এই অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে ভিন্ন। ইসলামিক সমাজে জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো সম্পর্কটা বেশি। অনুমান করা যেতে পারে এই ভাবনাটা এসেছিল পাঠান বা মুঘল সাম্রাজ্যে সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধের সম্ভাবনা কমানর জন্যই। আবার অন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হিন্দু রাজন্যরা ভেবেছিলেন পরস্পরের বিরোধ মেটান এবং সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার। রাজনৈতিক কূটকৌশল হিসেবেই তাঁরা 'ক্রস কাজিন' বা পালটা-পালটি বিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন। মামা-ভাগ্নীর বিয়ের পূর্বকথা বোধহয় একটু ভিন্ন। দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য-জাতির

মধ্যে অনার্য দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই সম্ভবতঃ এই বিশেষ সামাজিক-নীতি প্রচলিত হয়েছিল, মামা ও ভাগ্নীর বিবাহ সেখানে একটি বাঞ্ছিত ব্যাপার ছিল! সম্ভবতঃ বৈবাহিক সূত্রে যে সম্পত্তি হস্তান্তর হত, তার মালিকানা বা অধিকার যাতে সম্পূর্ণ না চলে যায়, সেই চিন্তা থেকেই মামা-ভাগ্নীর বিবাহের প্রচলন; দীর্ঘদিন এই ব্যাপারটি ঘটতে থাকায় বর্তমানে এটি দেশাচার ও লোকাচারের পর্যায়ে চলে এসেছে।

আধুনিক বংশগতিবিদ্যার যুক্তিতে বলা যায় জীবজগতের একটি স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে প্রাণী তার রক্তের সম্বন্ধের আত্মীয়দের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন! কিন্তু এই 'রক্তের সম্বন্ধের' সূত্র স্ত্রী প্রাণীদের ক্ষেত্রে যতটা খাটে, পুরুষ-প্রাণীদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। যে সব প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে বহুগামিতা (Polyandry) প্রচলিত, সেসব ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীরা স্বাভাবিক কারণেই তাদের সন্তানের প্রতি-বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে না। ইরভান ডি-ভোরের লেখা থেকে (Psychology Today, Feb, 1977) জানা যায় জনৈক এস্কিমো পুরুষ তার স্ত্রী-র সন্তানকে অপর পুরুষের সন্তান সন্দেহ হত্যা করেছে। বি-মাতা বা বি-পিতা যে সন্তানের প্রতি সাধারণত উদাসিন হন, তার অজস্র-উদাহরণ আমাদের অনেকেরই জানা আছে।

বংশগতির সূত্র অনুসারে কোন পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য দায়ী যে 'জিন,' তার অন্ততঃ আটভাগের একভাগ বা ১২·৫ শতাংশ বোনের ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বর্তায়। সুতরাং রক্তের সম্পর্কে মামা ভাগ্নী বা ভাগ্নে সরাসরি সম্পর্কিত। মামা ও ভাগ্নীর বিবাহ এবং তার সঙ্গে সেই বিশেষ সমাজের মেয়েদের বহুগামিতার সম্পর্ক আছে কি না এ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে ডঃ রিচার্ড আলেক্জাণ্ডার উপজাতিদের মধ্যে এ ধরণের সুস্পষ্ট যোগাযোগ দেখিয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্যদের সাথে অনার্য দ্রাবিড়দের ঘনিষ্ট সম্পর্কের সময় এ ধরনের কোন যোগাযোগ মামা-ভাগ্নীর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে কোন ভূমিকা নিয়েছিল কি না সেটা ভাববার বিষয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল—'আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে যে প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, এখনও এযুগে তা টিকে আছে কি করে?' অনেকেই মনে করেন এর একটা আইনগত দিক আছে। সম্পত্তির অধিকার খুব সম্ভবতঃ একটা বড় কারণ। সম্পত্তির সিংহভাগটা যাতে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তারই তাগিদে এখনো মামা-ভাগ্নীর বিবাহের প্রচলন আছে।

এবার বরং আসুন দেখা যাক, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই আন্তর্বিবাহ কতটা সমর্থনযোগ্য। এটা জানা আছে যে আমাদের দেহকোষে প্রত্যেকটির কেন্দ্রে আছে ৪৬টি ক্রোমোসোম যার ২৩টি এসেছে মা'র কাছ থেকে, আর বাকি ২৩টি বাবা'র সুত্রে পাওয়া। এই ২৩-জোড়া ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটিতে পুঁতির মালার মতো 'জিন' গুলি সাজান আছে, যারা আমাদের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জিনের গুণাবলী বংশ পরম্পরায় সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা, প্রভাব এই 'জিনের' ওপর পড়ছে ও পড়েছে অসংখ্যবার, ফলে জিনের গঠনগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে—বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম পরিব্যাপ্তি বা 'মিউটেশন'। এই পরিবর্তিত বা 'মিউটেটেড জিন' যখন একপুরুষ থেকে পরেরপুরুষে সঞ্চারিত হয়, তার প্রভাবে মানুষের গঠনগত এবং চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি ধীরে ধীরে পালটায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে প্রকারণভেদ বা 'জেনেটিক-ভ্যারিয়েশন'।

আধুনিক পরীক্ষানিরীক্ষায় জানা গেছে দেহকোষের মোট 'জিনের' মধ্যে অন্তত ৬ থেকে ১০ শতাংশই মিউটেশনের শিকার। এর মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন আমাদের পক্ষে শুভ আর কতগুলিই বা অশুভ—তা নিশ্চিত করে বলা মুস্কিল, কারণ গবেষণায় দেখা গেছে এই ধরনের মিউটেশন বা পরিবর্তনের ১০০টির মধ্যে ৯৯টিই ক্ষতিকারক হবার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য জীবজগতে সব সময় এই পরিবর্তনের ফলটা সেভাবে বোঝা যায় না—বংশানুক্রমে তা

প্রচ্ছন্নভাবেই থেকে যেতে পারে, এর কোন বহিঃপ্রকাশ নাও হতে পারে। অশুভ পরিবর্তনের বোঝা নিঃশব্দে 'জিনে'র পিঠে চেপে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাহিত হয়ে চলে। এরই নাম 'জেনেটিক লোড'।

আশঙ্কার কথা, বর্তমান দুনিয়ায় দিনের পর দিন এই 'জেনেটিক লোডের' পরিমাণ মানবজাতির মধ্যে বেড়েই চলেছে। এবং এর পেছনে আধুনিক বিজ্ঞানও অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে দায়ী। যথেচ্ছ রাসায়নিক আর তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার মানবদেহে প্রতিকূল মিউটেশনের হার বাড়িয়ে দিয়েছে! হিরোশিমা—নাগাসাকির সেই ভয়ঙ্কর বিকিরণ-প্রভাবের কুফল আজও অনেকে নিজেদের বা বংশধরের জিনে বহন করে চলেছেন!

সগোত্র-সপিণ্ড বিয়ে অর্থাৎ অন্তর্বিবাহও কিন্তু 'জেনেটিক লোড' বাড়াচ্ছে। জিনের গুণাবলী বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হচ্ছে এবং একজন সুস্থ ব্যক্তি সব সময়ই কিছু রোগ সৃষ্টিকারি জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে চলেছেন। পাত্র ও পাত্রী, এদের দুজনেরই যদি একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ (Comnon ancestor) থাকেন এবং তিনি যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোন বংশগত রোগ বহন করে থাকেন, তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা পাত্র বা পাত্রী, দুজনেরই আছে। ঘটনাচক্রে দুজনেই যদি সেই রোগ সৃষ্টিকারি জিনটি পেয়ে থাকেন, তাহলে তাদের সন্তানদের মধ্যে সেই প্রচ্ছন্ন জিন দুটির সঞ্চার ঘটবে এবং তার ফলে সেটি আর প্রচ্ছন্ন থাকবে না, বরং রোগলক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। বংশগতির সূত্র থেকে হিসেব কষে দেখান সম্ভব যে বিবাহের পাত্র পাত্রীর রক্তসম্বন্ধে আত্মীয়তা যত কাছাকাছি হবে, তাদের সন্তানের রোগগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

এই বিষয়টা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে বিদেশের বেশ কিছু বিজ্ঞানী সমীক্ষার কাজ চালাচ্ছেন। ভারতবর্ষেও এ ধরনের কিছু কিছু সমীক্ষা হয়েছে। গত ১৯৭১ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক

হিউম্যান জেনেটিকস্ কংগ্রেস হয়েছিল, তার এক সমীক্ষার ফলাফল জানিয়েছে যে উত্তর ভারতের ইসলামিক সমাজে জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনে বিয়ের ফলে পরবর্তী প্রজন্মে প্রজনন ক্ষমতা কমেছে। সন্তানদের মধ্যে ছেলের থেকে মেয়ের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 'সেক্স রেশিও ব্যালান্স' নষ্ট হচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হারও বাড়ছে। এসব কেবল অন্তর্বিবাহের জন্যেই হচ্ছে নাকি অন্যান্য কারণও রয়েছে—সেটা বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার আছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত 'জেনেটিক লোডের' বোঝা যেখানে মানুষজাতির ক্রমবিকাশের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাকে এড়াতে হলে অনাত্মীয় বিবাহ একান্তভাবে দরকার। শুধু অনাত্মীয়ই নয়, সম্ভব হলে এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণ, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বিয়ের ব্যাপারে গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এতে লাভ দু'ভাবে। সার্থক সংমিশ্রণের ফলে নতুন প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়বার সম্ভবনা তো আছেই, তার সাথে মা'-বাবার মধ্যে কার-ও যদি ক্ষতিকারক প্রচ্ছন্ন জিন থাকেও তাহলে তার চরিত্র প্রচ্ছন্নই থেকে যাবে। উপরন্তু কয়েক প্রজন্ম পরে সে ক্ষতিকারক 'জেনেটিক লোড' কমে যাবার সম্ভাবনাও আছে, কারণ ক্ষতিকারক প্রচ্ছন্ন জিনবাহী শুক্রাণুরা প্রায়শই সুস্থ সাধারণ শুক্রাণুর থেকে 'নিষেকের' বা 'ফার্টিলাইজেশনের' কাজে পিছিয়ে পড়ে বলে অনেক বিজ্ঞানীই ধারণা করেন।

শেষে হয়ত অনেকে প্রশ্ন তুলবেন—যে সব বংশে ডায়াবেটিস, হিমোফিলিয়া, বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া, জড়বুদ্ধি বা বিকলাঙ্গ ইত্যাদি বংশগত রোগের ইতিহাস নেই সেখানেও কি অন্তর্বিবাহ দোষের? আবার অনাত্মীয় বিবাহেও তো রোগগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী সন্তানের ঘটনা বিরল নয়? তাহলে?

প্রসঙ্গত বলি, বিজ্ঞানের ভাষায় একটি শব্দ আছে 'সম্ভাব্যতা' বা 'প্রোব্যাবলিটি'। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রতি ১০০টি অনাত্মীয় বিবাহের ৩টি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশু জন্মাবার সম্ভাবনা সাধারণ

ভাবেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে অন্তর্বিবাহের ফলে এই সম্ভাবনা না কি বেড়ে শতকরা ৬ থেকে ৮ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে!

২ লক্ষ জিনের মধ্যে ঠিক কোন বিশেষ জিনগুলি প্রচ্ছন্নভাবে কোন্ রোগলক্ষণ বহন করছে, তাদের নির্দিষ্ট করে চেনার উপায় এখনো বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। তবে 'জেনেটিক কাউনসেলিং' বা জিন সংক্রান্ত ডাক্তারি পরামর্শ আস্তে আস্তে প্রসারলাভ করছে। এই বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শের ব্যাপারে আমরা যদি একটু সচেতন হই, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মে 'জেনেটিক লোড' নিশ্চয় কমবে। বিয়ের ব্যাপারে এমনিতেই আমাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মীয় বা জাতিগত বাধা-নিষেধ ভবিষ্যত প্রজন্মকে দুর্বলতর করে চলেছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি সগোত্র, সপিণ্ড বিবাহের দিকে ঝুঁকি তাহলে সেটা কি বাস্তব বোধের পরিচয় হবে?

পুত্রার্থে ক্রিয়তে........

বাড়ীর ছোট মেয়ে। বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। মেয়ে এবার মা হতে চলেছে—বাপের বাড়ী এসে ছোট ভাইটাকে দুটো আঙ্গুল এগিয়ে বলে—একটা ধর্‌তো। বল্ দেখি কি হবে? ছেলে না মেয়ে? ভাই যদি সেই আঙ্গুলটা ধরে যা মনে মনে ছেলের জন্যে ঠিক করা ছিল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বোনের মুখ। কিন্তু যদি অন্য আঙ্গুল ধরে ভাই, বোনের মুখ কাল হয়ে যায়। নাঃ, ঠিক হল না। আবার ধর্‌তো....। সাধ খাওয়ার সময় প্রদীপ না শিলনোড়া —এমন নানা লোকাচার; এ সময়টা ঘরে ঘরে মেয়ে জন্মাচ্ছে, জানি না কি হবে—এমন নানা আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে মেয়ে যখন হাসপাতাল যাবার সময় কান্নাকাটি শুরু করে, মা, পিসিমা মাথায় হাতে বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন—চোখেমুখে এমন কালি পড়েছে, ছেলে না হয়ে যায় না। প্রচণ্ড কষ্টের ভেতরও ক্লিষ্ট হাসি ফোটে মেয়ের মুখে.......।

পুত্র সন্তানের জন্যেই দার-পরিগ্রহ করা—প্রবচনটা আসমুদ্র-হিমাচলের ভারতবাসী বোধহয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তা না হলে আজও কেন মনে করা হয় পুত্রসন্তান না হলে বংশলোপ পাবে? প্রাচীনকালে রাজারাজড়ারা পুত্রের আশায় একাধিক বিয়ে করতেন, এযুগেও জাঁদরেল শাশুড়ীরা ছেলে মেয়ে না হলে বৌকে শাসান—নেহাত হিন্দু আইনে একটার বেশি বিয়ে করা যায় না তাই রক্ষে! আবার কন্যাসন্তান জন্মানর পর ঐ ঠাকুমাই আক্ষেপ করেন—ও বাড়ী থেকে মেয়ে আনাই ভুল হয়েছে, ওদের যে মেয়ের গুষ্টি। তাদের বাড়ীর মেয়ে সুতরাং মেয়ে বিয়োবে, এটাই তো স্বাভাবিক! অনেক শিক্ষিত ছেলের মুখেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—মেয়ের জন্ম দেওয়া ওদের বংশের ধারা, ইত্যাদি-ইত্যাদি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ভীড় করে আসে মনে—সত্যিই তো, কন্যাসন্তান জন্ম

দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা কতটা? এমনটিও দেখা গেছে যাঁর পর পর দুটি বা তিনটি কন্যাসন্তান জন্মেছে, তিনিও অনেক সময় ডাক্তারের কাছে জানতে ছোটেন—স্ত্রীর শরীরে বিশেষ কোন গণ্ডগোল আছে কি না, যার ফলে বারবার মেয়ে জন্মাচ্ছে!

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে 'মা-এর সন্তান জন্ম দেওয়া এবং সে সন্তান ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়া'—বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা কি? প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট— ৪৬। এই ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে চুয়াল্লিশটি লিঙ্গ নির্ধারণে কোন ভূমিকা নেয় না, এ ব্যাপারে দায়ী বাকি দুটি ক্রোমোসোম, যাদের নাম যৌন-ক্রোমোসোম। স্বাভাবিক যে কোন মহিলার এই যৌন-ক্রোমোসোম দুটি একই ধরণের, বিজ্ঞানের ভাষায় XX। কিন্তু পুরুষদের এই ক্রোমোসোম দুটি আকৃতিগত ভাবে ভিন্ন, সুতরাং তারা XY। আমরা জানি সন্তান সৃষ্টি নারী-পুরুষের যৌথ প্রক্রিয়ার ফল। সে হিসেবে যদি পিতৃসূত্রে একটি কোষ ও মাতৃসূত্রে অপর একটি কোষ মিলিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাহলে আপাতভাবে মনে হতে পারে ভ্রূণের ক্রোমোসোম সংখ্যা হওয়া উচিত ৪৬+৪৬ =৯২! কিন্তু যেহেতু যে কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট—সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে বিশেষ এক ব্যবস্থা আছে যাতে ভ্রূণের ক্রোমোসোম সংখ্যা ৯২ না হয়ে ৪৬ই হতে পারে। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু অর্থাৎ যাদের মিলনের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হবে, তাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৬-এর পরিবর্তে ২৩। অর্থাৎ ভবিষ্যতে শুক্রাণু (২৩)+ডিম্বাণু (২৩)=ভ্রূণ (৪৬), এই ক্রোমোসোম সংখ্যা স্থির থাকে।

শুক্রাণু বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হবার সময় জনন কোষে 'মিয়োসিস' পদ্ধতিতে (Meiosis) বিভাজন ঘটে, ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা যায় অর্ধেক হয়ে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বিভাজনের ফলে যে দুটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হল (একটি অবশ্য পরে নষ্ট হয়ে যায়) তাদের ক্রোমো-

সোমগুলো একইরকম—২২ + X। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর ক্রোমোসোমের গঠন দু-ধরনের হতে পারে—২২ + X অথবা ২২ + Y। এবার দেখা যাক, ভ্রূণ সৃষ্টির সময় তার ক্রোমোসোমের গঠন কি হতে পারে।

যদি X-যৌন-ক্রোমোসোমবিশিষ্ট কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত (Fertilize) করে, সেক্ষেত্রে ভ্রূণের ক্রোমোসোমের বিন্যাস হচ্ছে—ডিম্বাণু (২২ + X) + শুক্রাণু (২২ + X) = ৪৪XX, অর্থাৎ কন্যাসন্তান। কিন্তু যদি Y-যৌন ক্রোমোসোম বিশিষ্ট কোন শুক্রাণু নিষেকে অংশ নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্রূণের ক্রোমোসোম বিন্যাস হবে—ডিম্বাণু (২২ + X) + শুক্রাণু (২২ + Y) = ৪৪ + XY, অর্থাৎ পুত্রসন্তান।

সুতরাং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে সে ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা নেই বললেই চলে, কারণ ডিম্বানুর ক্রোমোসোম বিন্যাস সব সময়ই ধ্রুব—(২২ + X)। লিঙ্গ-নির্ধারণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে শুক্রাণুর, অর্থাৎ পিতৃসূত্রে যা এসেছে। সুতরাং কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া মায়ের বংশগত ব্যাপার বা মায়ের গলদ—এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থা এমনই যে সন্তান প্রসবের কষ্ট পুত্র বা কন্যা উভয়ক্ষেত্রে এক হলেও ছেলে না হয়ে মেয়ে জন্মালে মায়ের কাছে সংবাদটা প্রাথমিকভাবে গিয়ে দাঁড়ায় দুঃসংবাদে। আগে যদি দুটি বা তিনটি মেয়ে হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারের নীতি হল 'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ'……। শুরু হয় নানা দেবস্থানে ধরণা, তাবিজ-কবচ-মাদুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোনক্রমে পরেরবার পুত্রসন্তান জন্মাল তো ব্যাস, পাঁচজনের বিশ্বাস বাড়ে দশগুণ, ধর্মস্থানের মহিমা বাড়ে শতগুণ অথচ সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি যে 'সম্ভাব্যতা' বা 'প্রোব্যাবলিটির' সূত্র মেনে চলে, তার কথা ভুলেও কেউ ভাবেন না। আবার তথাকথিত ভাবে আধুনিক, দেবস্থানের মাহাত্ম্যকে 'বোগাস' মনে করেন,

৭

'বৈজ্ঞানিকভাবে' সমস্যার সমাধান করতে চান, এমন কিছু উটকো পরামর্শদাতা আছেন যাঁরা সামান্য বিদ্যা সম্বল করে নানা উপদেশ দিয়ে থাকেন। এবং প্রায়শই তা 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকবছর আগেকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ শহরতলীর বাসিন্দা এক বিবাহিত ভদ্রলোক জনৈক 'বিজ্ঞ' পরামর্শদাতার কাছ থেকে 'উপদেশ পান' নিষেকের সময় ডিম্বনালীর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের ওপর নির্ভর করে ভ্রূণটি স্ত্রী হবে না পুরুষ হবে। শুধু এইটুকু জানলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু পরামর্শ অনুসারে ভদ্রলোক নিজের স্ত্রীকে প্ররোচিত করলেন সোডাজলের 'ডুশ' নিতে একটানা পনের দিন। এবং এর যা অনিবার্য ফল তাই হল, কড়া ক্ষারের সংস্পর্শে জরায়ুমুখে ঘা— কোনক্রমে বিশেষজ্ঞ-ডাক্তারের পরামর্শে ভদ্রমহিলা বেঁচে যান সে যাত্রা। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, যৌনমিলনের পরে একঝাঁক শুক্রাণু যখন ডিম্বনালীর মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, তখন তাদের মধ্যে কোনটি যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে তা বলা অসম্ভব। বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র বলতে পারেন, দলের মধ্যে সবথেকে বেশি শক্তিশালী যে, জেতার সম্ভাবনা তারই বেশি। কী কারণে সেটি বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল, তার মধ্যে কি কি জীবরাসায়নিক পরিবর্তন হয়েছে বা তার পরিবেশের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বা অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন শুক্রাণুর গতিবিধির ওপর ঠিক কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা বলা মুশকিল। সুতরাং বলাই যেতে পারে ভ্রূণ ছেলে হবে না মেয়ে হবে তার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে সম্ভাবনাতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে। অবশ্য বিজ্ঞানী মহলে ইচ্ছানুসারে সন্তানের লিঙ্গ-নির্ধারণের চেষ্টা চলছেই। বার্লিনের শেরিং গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে দেখিয়েছেন, যে সব শুক্রাণু কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে পারে তাদের মধ্যে প্রাণের মূল উপাদান ডি-এন-এ-র (DNA) পরিমাণ সামান্য বেশি থাকে এবং তারা চালচলনে Y-ক্রোমোসোম বিন্যাসযুক্ত শুক্রাণুর চেয়ে (যারা পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারে) অপেক্ষাকৃত

মন্থর হয়। এই বিশেষ গুণের ভিত্তিতে তাঁরা ভারী শুক্রাণুদের পৃথক করতেও সক্ষম হয়েছেন; অবশ্য পুরোটা নয়। স্বাভাবিকভাবে পুরুষের বীর্যে X ও Y-যুক্ত ক্রোমোসোমের ভাগ ৫০ : ৫০, ঐ গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা X ও Y-এর এই অনুপাত পালটিয়ে যথাক্রমে ৮৫ : ১৫ পর্যন্ত করতে পেরেছেন! X-ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের কাজে ব্যবহার করছেন, বিশেষতঃ গো প্রজননের ক্ষেত্রে, কারণ গাই-গরুর চাহিদা সবসময়ই বেশি—তারাই দুধ দেয়। মানুষের ক্ষেত্রে এ-ধরনের পরীক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়নি, তার কারণও বোধহয় সামাজিক। ('টেষ্ট-টিউব বেবি' আজও তেমন ভাবে জনপ্রিয় হয়নি কোন দেশে, বন্ধ্যাত্বের ইতিহাস জানা থাকলেও উৎসাহবশতঃ এগিয়ে আসেন না প্রায় কেউ-ই।) পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর ওপর পুরুষের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারবোধ এমন পাকাপাকিভাবে গেঁথে আছে যে, যদিও বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্ম ইচ্ছা অনুসারে ঘটানো যেত তাহলেও পুত্রসন্তান কামনার দিকে পাল্লাটা অবধারিত ভাবে হেলে পড়তো বলেই মনে হয়।

বাস্তব বড় নির্মম এখন! বর্তমান সমাজের অমানবিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যে পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ মজবুত নয়, সেখানে পণ-যৌতুকসহ-বিবাহের আশঙ্কা মাথায় রেখে বাবা-মা'র পক্ষে মেয়ে না চাওয়া হয়ত অযৌক্তিক নয়। কারণ যতদিন না 'মেয়ে মাত্রেই গলগ্রহ' এ ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটছে, ততদিন অধিকাংশ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাবা-মা ই কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য হীনমন্যতায় ভুগবে। অথচ সমাজের ওপরতলার বাসিন্দা যারা, অর্থের অভাব যাদের নেই, তারাও কিন্তু মেয়ে চায় না। এ-ব্যাপারে নির্মম কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে আধুনিক স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ও ধাত্রীবিদ্‌দের। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে বলে দিতে পারা যায় মায়ের গর্ভে যে ভ্রূণটি বেড়ে উঠছে সেটি ছেলে না মেয়ে হিসেবে জন্মাবে। এতে বিপদ হয়েছে এই যে,

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল অনেক পরিবার, যাদের ইতিমধ্যে দুটি বা তিনটি কন্যাসন্তান হয়ে গেছে, তারা যদি জানতে পারেন আসন্ন সন্তান মেয়ে হবে, তাহলে ডাক্তারদের পীড়াপীড়ি করা হয় গর্ভপাত ঘটিয়ে ভ্রূণ হত্যা করানোর জন্য। অর্থগৃধ্নু পরিবারগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় ছেলে মানেই টাকা লক্ষ্মী ও মুনাফার চমৎকার উপায়! ছেলের বিয়েতে যদি বেশ কয়েক সহস্র টাকা বিনা পরিশ্রমে আয়ত্ত করে তা নিজের কারবারে খাটান যায় তাহলে সে সুযোগ ছাড়ে কে? অতএব, মেয়ে নয় ছেলে চাই।

এছাড়াও একটি সাধারণ মনস্তত্ত্ব ধনী গরীব নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রেই কাজ করে। তা হল—ছেলেরাই বংশের ধারক ও বাহক, মেয়েরা নয়। অথচ সত্য এই যে, একই পরিবারের ভাই বা বোনের মধ্যে পিতৃসূত্রে পাওয়া বংশগত বিশেষত্বের অনুপাত সমান (বরং আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে—বংশের বৈশিষ্ট মেয়েদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কেননা যৌন-ক্রোমোসোম Y-এর তুলনায় X আকারে বড় হওয়ায় তার মধ্যে বংশাণু বা 'জেনেটিক মেটেরিয়াল ডি. এন. এ-র'-পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ মেয়ে ক্রোমোসোমের পাল্লা ভারী!)

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন—বহুযুগ ধরে পুত্রকে বংশের ধারক ও বাহক বলা হচ্ছে তা কি তাহলে সবটাই ভ্রান্ত ধারণা কিংবা কুসংস্কার? আসলে এ ধারণার পেছনে বিজ্ঞানের যুক্তির থেকে সামাজিক বিলি-ব্যবস্থার দান অনেক বেশি। সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি ব্যাপার পুরুষানুক্রমে ছেলেদের মধ্যেই বর্তায়; বিয়ের পর ছেলেদের শ্বশুরঘর করতে যেতে হয় না; সংসারের 'কর্তৃত্ব' নামক সম্পদটির ভাগীদার সর্বদাই পুরুষ বা ছেলে—এরকম নানা প্রথাই বংশের ধারক হিসাবে ছেলেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বংশগতির সূত্র বিশ্লেষণ করলে একটা বিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক-চিত্র মিলতে পারে। যে কোন পুত্রসন্তান তার পুরুষত্বের সূচক Y-ক্রোমোসোমটি পাবে বাবার কাছ থেকেই। সেই ছেলের যদি আবার পুত্র সন্তান জন্মায়, তাহলেও

কিন্তু ঐ Y-ক্রোমোসোমটি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ ঠাকুর্দার Y-ক্রোমোসোমটি নাতির মধ্যে অবিকৃতভাবে প্রবাহিত হবে। কিন্তু মেয়ের তরফে বংশধারায় ঐ বিশেষ Y-ক্রোমোসোমের প্রবাহ সম্ভব নয়।

সুতরাং বংশানুগতির ধারাবাহিক চিত্রটির মধ্যে শুধুমাত্র Y-ক্রোমোসোমের কথা ধরলে, তাকে অবিকৃতভাবে বহন করার ক্ষমতা শুধুমাত্র পুত্রসন্তানেরই রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু Y-ক্রোমোসোম কি ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে? এ নিয়ে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা যা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে Y-ক্রোমোসোমে যে সব গুণাবলীর চাবিকাঠি রয়েছে সেগুলি হল—পুরুষত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন, কানের লোমের বাহুল্য, উচ্চতার উপাদান আর বদমেজাজ বা রুক্ষতা। স্পষ্টতই, কোন বংশের বৈশিষ্ট্য এই গুণগুলোর ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং কেবল Y-ক্রোমোসোম প্রবাহিত হওয়ার সুবাদে বংশরক্ষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অতএব এরকম মন্তব্য করা অসমীচীন হবে না যে, কোন সমাজেই পুরুষ প্রাধান্যের রীতি বা সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক সমর্থন পেতে পারে না। সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, পুরুষ বা নারী, কোনদিকেই পাল্লা ভারী হওয়ার কথা নয়। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই গোটা বিশ্বের মোট জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত সবসময়ই একটা স্বাভাবিক সমতা বজায় রেখে চলে।

উপসংহার :

ব্যক্তিগতভাবে আমি এক দম্পতিকে জানি যাঁরা শহরাঞ্চলে বাস করেন, মাসিক আয় কোনভাবেই সাতশো টাকার বেশি নয়, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শিক্ষার আলো পেয়েছেন। গত দশ-বছরের দাম্পত্য জীবনের ফসল পাঁচটি সন্তান। প্রথম তিনটি মেয়ে পরের দুটি যমজ ছেলে। এতদিনে তাঁরা ক্ষান্ত দিলেন। তাঁদেরই প্রতিবেশী অপর এক দম্পতির চারটিই কন্যাসন্তান, পঞ্চমটির জন্ম আসন্ন। এটিও যদি ছেলে না হয় তাহলে আরো ক'টি যে হবে তার গ্যারান্টি তাঁরা নিজেরাও দিতে পারেন না।

তবে কি ধরে নিতে হবে কন্যাসন্তানের কোন চাহিদাই নেই আমাদের সমাজে? আছে, যদি সেই কন্যা আর্থিক বল-ভরসা এনে দেন। অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত কথোপকথনের একটি ছোট্ট নমুনা তুলে দি।

* * *

—গোপালের মা, আজ এত দেরী যে?

—কি করব বৌদি, মেজমেয়েটার কাল মেয়ে হয়েছে, সকালে হাসপাতাল ঘুরে কাজে আসতে দেরি হয়ে গেল!

—তোমার মেয়ের তো দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে—আবার একটা মেয়ে হ'ল? এরার 'অপারেশন' করিয়ে নিতে বল না? মেয়ে মানেই তো ঝামেলা?

—কি যে বলেন বৌদি, মেয়েরাই তো আমাদের ঘরের লক্ষ্মী! এত বাড়ির কাজ কি একা হাতে সামলান যায়? ছেলেগুলো তো সব অপদার্থ! মেয়ে আমাদের বেঁচে থাকুক!

রক্তের দোষে........

—বৌদি, কুড়িটা টাকা দিও তো।

—মাসের মাঝে আবার টাকা কেন ?

—না গো, এ টাকা পূজো দিতি যাবে। সংসারের গব্বে যাবে না।

—কিসের পূজো গো মেয়ে ?

—আর বোলো না বউদি। ঐ যে আমার মেয়ে, যতো জ্বালা তো ওকে নিয়েই।

—কেন, মেয়ের কি হল ? সেই তো সেবার শুনলাম মেয়ের ঘরে মেয়ে হয়েছে ?

—না গো বাচ্চাটা বেশিদিন বাঁচলো নি। এর পরেও দুবার পেটে এয়েছিল। একটা হয়ে নষ্ট গ্যালো, আর একটা পেটে থাকতি থাকতিই......। জামাই বলতেছে ঘরে নেবে না।

—সে কি ? হাসপাতালে দেখাও গে ভাল করে।

—ও কিছু হবার নয় গো। 'মল্লির দোষ' হতেছে—পূজো দিতি হবে, উপোস করতি হবে। দেশে জাগ্রত ঠাকুরের থান আছেন, দোর ধরে মানত দিছি। সামনের বিস্যুতবার দিন ভাল আছে, ওদিন পূজো দিতি যাব—কাজে আসব নি। দাদাবাবুর কাছ দে টাকাটা নিয়ে রেখো বৌদি।

*　　　*　　　*

প্রথম বাচ্চা সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকলেও পরবর্তী শিশুগুলি জন্মের পর বা জন্মগ্রহণের পূর্বেও মারা যাওয়ার রহস্য জানা গেছে মাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-র মধ্যে। কৃতিত্বের দাবিদার দুই বিজ্ঞানী, ল্যাণ্ডস্টাইনার এবং ওয়াইনার। এঁরাই প্রথম বলেন —মৃতবৎসার সন্তান না বাঁচার কারণ 'রক্তের দোষ'। আপাতভাবে ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে—একই বাবা মা'র প্রথম

সন্তানটি দিব্যি বেঁচে রইল, অথচ রক্তের দোষে পরের সন্তান একটিও বাঁচল না? সন্তান বিশেষে 'রক্তের দোষের' এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

এই 'রক্তের দোষ' কি ও কেন—বলতে হলে প্রথমেই আসে 'ব্লাড গ্রুপের' কথা এবং তার সঙ্গে বংশগত নানা রক্তের অসুখের ব্যাপারস্যাপার! যেমন ধরা যাক 'থ্যালাসিমিয়া' রোগটির কথা। রক্তের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের গঠনগত কিছু ত্রুটির ফলেই রোগটির সৃষ্টি। কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের হিম্যাটোলজি বিভাগের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, প্রায়শই তাঁদের কাছে দু-থেকে পাঁচ মাস বয়সের শিশুদের নিয়ে আসা হয় যারা প্রচণ্ড রক্তাল্পতা এবং আনুষঙ্গিক থ্যালাসিমিয়ার উপসর্গে ভুগছে। রক্ত পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়ার পর নিয়ম অনুসারে বাবা এবং মা—দুজনেরই রক্ত পরীক্ষার রেওয়াজ আছে। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে বাবা-মা দুজনেই প্রচ্ছন্নভাবে এই রোগের বাহক। ফলে দুজনের 'জীনের' সংমিশ্রণের সুবাদে চাপা থাকা অসুখটি বংশগতির সূত্র অনুসারে সন্তানের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—তারই ফল হিমোগ্লোবিনের ঐ গঠনগত ত্রুটি। এসব ক্ষেত্রে হাজার চেষ্টা করলেও নবজাতকের স্বল্প আয়ুকে দীর্ঘতর করা সম্ভব নয়। 'থ্যালা-সিমিয়া' ছাড়াও এইধরনের রক্তের অসুখের লিষ্টে আছে 'সিক্‌ল্-সেল-অ্যানিমিয়া', 'ক্রনিক কনজেনিট্যাল হিমোলাইটিক জনডিস', এমনি নানা দুরারোগ্য রক্তের রোগ। অথচ এইসব রোগ থেকে সন্তানকে সহজেই বাঁচান সম্ভব হত যদি বিয়ের আগে পাত্র এবং পাত্রী দুজনেই একটু বিশদভাবে রক্ত পরীক্ষা করাতেন। সেক্ষেত্রে এই-ধরনের বিপত্তি ঘটত না। বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক আগে ভাগেই পূর্বাভাষ দিতে পারতেন যে এই বিয়ে কখনই 'আদর্শ' নয়, কারণ রক্তের বিচারে পাত্র এবং পাত্রী একে অপরের পরিপূরক কখনই নয়। অথচ দুঃখের কথা এই যে, বিয়ের ব্যাপারে আমরা প্রায় সবাই কোষ্ঠী-ঠিকুজিকেই অন্ধভাবে মানার চেষ্টা করি, অথচ কেউই আমরা 'ম্যারেজ কাউন্সিলিং' বা বিবাহ সংক্রান্ত ডাক্তারী পরামর্শের ব্যাপারটা পাত্তা দিই না।

অবশ্য এ-ধরনের নানা বংশগত অসুখবিসুখ শিশুমৃত্যুর জন্য যত না দায়ী, তার থেকে অনেক বেশি দায়ী ব্লাড-গ্রুপের ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা। অপারেশন, হাসপাতাল, নার্সিংহোমের কল্যাণে আজ আমাদের জানা হয়ে গেছে, যে কোন মানুষের শরীরে যে কোন রক্ত দেওয়া যায় না, 'গ্রুপ'-মিলিয়ে রক্ত-দেওয়া একান্ত দরকার। 'গ্রুপ' না মিললে রক্তের দোষ হয়, ভিন্ন-ধরনের রক্ত একে অপরের সংস্পর্শে এলে রক্তকণিকারা ভেঙ্গে যায়। ফলে 'A,' 'B,' 'O' ইত্যাদি 'গ্রুপ' মিলিয়ে তবেই রক্ত দেওয়ার প্রশ্ন আসে। ল্যাণ্ডস্টাইনার এবং ওয়াইনার প্রথম বলেছিলেন যে শুধু ABO গ্রুপ মেলালেই হবে না, আরো একটা গ্রুপ মেলাতে হবে– তা হল রক্তে Rh-এর ব্যাপার। যাদের রক্তের লোহিত কণিকায় Rh বলে বিশেষ এক ধরণের অ্যান্টিজেন অণু আছে, তাদের রক্ত কখনই এমন লোকের রক্তে মেশান যাবে না, যাদের রক্তের লোহিতকণিকায় Rh-নেই। ব্যাপারটা একটু বিশদ করে বললে বলতে হয়—যে রক্তে Rh-নেই (Rh-নেগেটিভ), তার মধ্যে Rh যুক্ত লোহিতকণিকারা (Rh-পজেটিভ) যদি কোনভাবে মিশে যায়, শরীর তাদের 'শত্রু' বলে ভাবতে শুরু করে, রক্তরসে তৈরী হয় বিশেষ ধরনের 'অ্যান্টিবডি' যার কাজ Rh-যুক্ত লোহিতকণিকাদের ধ্বংস করা। একবার যদি রক্তে Rh-এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়ে যায়, তাহলে তা স্থায়ী প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে, অর্থাৎ পরবর্তীকালে যদি কোন Rh-যুক্ত লোহিতকণিকা শরীরে আসে, তাকেও সে ধ্বংস করবে সঙ্গে সঙ্গে।

এবার দেখা যাক—মৃতবৎসার সঙ্গে Rh-এর সম্পর্কটা কোথায়। বাবা এবং মা, দুজনেই যদি Rh-পজেটিভ বা Rh-নেগেটিভ হন, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু একজন যদি Rh-পজেটিভ এবং অপরজন যদি Rh-নেগেটিভ হন, গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা সেইসব ক্ষেত্রে থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে বংশগতির নিয়ম অনুসারে সন্তান Rh-পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোন একটা হতে পারে। বিপদ

ঘটবে সেই সব মায়েদের যাঁরা Rh-নেগেটিভ অর্থাৎ যাঁদের রক্তের লোহিতকণিকায় Rh নেই, অথচ যে ভ্রূণটি তিনি গর্ভে ধারণ করছেন তার Rh-পজেটিভ। 'প্লাসেণ্টার' মাধ্যমে মা ও ভ্রূণশিশু একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রাখে, এবং এই 'প্লাসেণ্টার' ফাঁক গলে ভ্রূণের রক্ত থেকে দু চারটি Rh-পজেটিভ লোহিতকণিকা এসে হাজির হতে পারে মা'র রক্তে। 'ইমিউনাইজেশনের' স্বাভাবিক নিয়মেই মা'র শরীরে Rh-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরী হতে শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধকারী 'অ্যান্টিবডি' তৈরী হয় খুব সামান্য পরিমাণে—যা ভ্রূণের পক্ষে খুব একটা মারাত্মক নয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, মা'র মনেও কোন সন্দেহ জাগে না। বিপদ ঘটে পরবর্তী সন্তানের বেলায়। ইতিমধ্যে মা'র রক্তে Rh-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বেশ জোরদার হয়েছে অর্থাৎ রক্তে Rh-এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়েছে এবং যদি পরবর্তী ভ্রূণটি বাবার সূত্রে Rh-পজেটিভ হয়, মা'র রক্তের প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি অণুরা 'প্লাসেণ্টার' বাধা পেরিয়ে মিশে যায় ভ্রূণের রক্তে—ভাঙতে থাকে ভ্রূণের লোহিত-কণিকাগুলো। ফলে ভ্রূণটি হয় গর্ভেই মারা যায়, মা প্রসব করেন মৃত সন্তান, নয় তো শিশুটি জন্মায় গুরুতর রক্তাল্পতা এবং জনডিস নিয়েই। এইসব শিশু সাধারণভাবেই বাঁচে বড়জোর কয়েকসপ্তাহ মাত্র। বারবার গর্ভধারণ ক'রে একই দুঃখজনক ফল। পরিবারের লোক বা আত্মীয় প্রতিবেশীরা তখন একটাই সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পায়—মা'টাই পোড়াকপালি। মরা বাচ্চা বিয়োনোই ওর কপাল! ছাপ পড়ে গেল—মৃতবৎসা! অথচ এটি একটি শারীরিক অসুবিধা বা অসুখ-মাত্র, মা-এর কোন কিছুই করণীয় যেখানে নেই, উপযুক্ত চিকিৎসা করানোই একমাত্র সমাধান। তবু নিগৃহীতা হতে হয় নারীকে।

প্রশ্ন আসতেই পারে—এইসব শিশুদের কি বাঁচান যায় না? ঘোচান যায় না মায়েদের এই 'মৃতবৎসা' নাম?

অবশ্যই যায়, কিন্তু আমাদের মত দেশে তা কতটা পারা যায়, তা

তর্কের অবকাশ রাখে বৈকি! প্রথমতঃ, শিশু জন্মানোর ঠিক পরেই যদি 'রক্তাল্পতা' ও 'জনডিস' ধরা পড়ে এবং বোঝা যায় Rh-জনিত বিপত্তিই এর কারণ, সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে 'এক্সচেঞ্জ-ট্রান্সফিউশন' দিতে হবে। অর্থাৎ আস্তে আস্তে শিশুর শরীরে Rh-নেগেটিভ রক্ত দিতে হবে, অন্য পাশ থেকে বার করে নিতে হবে শিশুর নিজের Rh পজেটিভ রক্ত। এক্ষেত্রে নতুন রক্তের লোহিত কণিকায় Rh অ্যান্টিজেন না থাকায়, তারা তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে যাবে না—শিশুটি বেঁচে যাবে সে যাত্রা। কিন্তু এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ রক্ত তা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত পাওয়ার জন্য মেহনত লাগে কতটা! বাইরে থেকে অবশ্য কিনতে পাওয়া যায়—তবে বোতল পিছু খরচ কমপক্ষে শ'দেড়েক টাকা!

সে সব পরিবারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা নেই, যাদের সাধারণতঃ সন্তান প্রসব হয় নার্সিং-হোমে, সেই সব মায়েদের জন্য বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে। বাজারে 'রিগ্যাল' ও 'রোলিন' দুটি ইনজেকশন আছে, যারা রক্তে Rh এর বিরুদ্ধে সক্রিয় অ্যান্টিবডিকে নষ্ট করে দিতে পারে। যে সব মায়েদের রক্ত Rh-নেগেটিভ, তাঁদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই, এরকম একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। এতে ভবিষ্যত সন্তানের জন্ম এবং বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত হয়। তবে ছোট্ট এক অ্যাম্পল এই ইনজেক্শনের দাম পড়ে প্রায় চার থেকে সাড়ে চারশো টাকা! এবং পাওয়া যায় বড় বড় শহরের মুষ্টিমেয় কয়েকটি দোকানে! সুতরাং—

* * * * *

শুরুর গল্পে আবার ফিরে আসি।

পাঁচ বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে লক্ষ্মীর মা দেশেও গেছে, উপোসও করেছে, ঠাকুরের থানে পূজোও দিয়েছে।

—এবারও লক্ষ্মীর ছেলেটা বাঁচেনি।